না-ঘরকা না-ঘাটকা

দিবাকর সী

মায়া পাবলিকেশন। কলিকাতা

প্রকাশক ঃ
অশোক মান্না
মান্না পাবলিকেশন
এরেটী, গোপমহল, মেদিনীপুর ৭২১ ২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬২

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর ঃ
সিদ্ধার্থ রায়
কালীমাতা প্রিন্টিং (বর্ধন প্রেস)
৮/৪-এ কাশী ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ
ডায়মন্ড (ইন্ডিয়া) / এবিসি পাবলিকেশন
নবীন কুন্ডু লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

হ্যাঁ, জী! প্রতিদিন আমার শূন্যতার দিন। প্রতিদিনই আমি ক্ষেতখামারে ধুলো-কাদা-আবর্জনার স্তূপে ঘুরপাক খাই। ঘুরে ঘুরে মরি। দেখি, আমার চারপাশের লোকজনেরা হাসি-কান্না-হাহাকার-যন্ত্রণার থেকে বেরুতে পারে না, কাঁদে। ককিয়ে ওঠে। প্রতিবাদ করে।

এই পুণ্যবান দেশের পুণ্যাত্মা শাসক তার রাজা-প্রজার মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান রেখে যাচ্ছে তার সমাধান কবে হবে! কবে কে করবে। শাসক যারা আসে তারা প্রতিনিয়ত নূতন কথা বলে অথচ পুরানো কাজ করে। ফলে আমাদের শূন্যতার বৃত্ত বড় হয়ে যায়, সংসারটার পরিবর্তন হয় না। যা ছিল তাই-ই থেকে যায়।

এই বৃত্তের মধ্যেই আমার অকপট অনুভূতি। আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মূলেই আমার গল্পগুলি। এগুলি সফল গল্প কিনা আমি জানি না। আমি তাদের যেমন দেখেছি তেমন করেই বলেছি। তারা বড় কষ্টে আছে গো। বড় কষ্টে। তবে এটাও ঠিক, আমার গল্পের চরিত্রগুলি খুব দ্রুত থাবড়ে সংসারটা বদলে দেবে। তারা একদিন আর কাঁদবে না, পিটোবে।

প্রকাশক অশোক মান্না আমাকে পাইরীকুণ্ড থেকে ধরে এনেছে ঠিক ডাকপাখী ধরার মতো। তার ধৈর্য আর প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়া 'না-ঘরকা না-ঘাটকা' বই আকারে বের হতে পারত না। বন্ধু অসিত দত্ত, শ্রদ্ধেয় অমিয় চক্রবর্তী শ্রদ্ধেয় রঞ্জিত ব্যানার্জীর সহযোগিতা আমাকে উৎসাহিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। প্রুফ দেখেছেন দাশরথি মুখোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার আর্ট-ডিরেক্টর অমিয় ভট্টাচার্য। এঁদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি কৃতজ্ঞ।

ঘাটাল (মেদিনীপুর) — দিবাকর সী

২৩ জানুয়ারি, ১৯৮২

শ্রীমতী পঞ্চমী দেবী

স্তন্যদায়িনী মা আমার

ভাঁটি

ধড়মড়িয়ে ঘুম ভেঙে গেল মেগীর। চ্যাক্ করে উঠলো পা দুটো। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা লাগলো। চোখ দুটো রগড়ালো। কানাইডুমটা দেওয়ালের এক কোণে টিম্ টিম্ করছে। কাউকেই প্রায় চেনা যাচ্ছে না। ভাল করে দেখলো। গরম জলটা কেন গন্ধ ছাড়লো ? পোয়াতি ছাগীটা জাবর কাটতে কাটতে চোখ বুজিয়ে পেচ্ছাব করছিল মেগীর পায়ে। কোলের বাচ্চাটা নেতিয়ে ঘুমোচ্ছে পাশেই। ডান দিকে ইন্দর প্রায় আধ-ল্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে। হুঁশ নেই। ঘুম-ভাঙা তো দূরের কথা। তার ডান পা-টা ঘুরিয়ে পড়েছে ঘরের কোণে ঢাকা দেওয়া ভিজে ভাতের ডিশে! মেগীর বাঁ দিকে আরো দুটো ছেলে, একটা বড় মেয়ে শুয়ে ছিল। বড় মেয়ের নাম সখী। বয়েস বড়জোর দশ বছর হবে। এরই মধ্যে সর্বমোট চারটি সন্তান তাদের।

ভিজে ভাতের ডিশের ডান দিকে ইন্দরের মা শুয়ে আছে। মশারির বালাই নেই। প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছরের বুড়ী তিনটে থলে জুড়ে, ছেঁড়া জালের বালিশ ক'রে ঘুমোয়। আলো নেই পাখা নেই, ঢাকা নেই। মশা, বিছা, ছারপোকার মতো বন্ধুরা বিরক্ত করলেও বুড়ী কিছুই করতে পারে না।

খুব অসহ্য হোলে বুড়ী ডাকে : 'ইন্দর সকাল হলে বৌকে বলে ছারপোগুলো মেরে দিবি।'

ইন্দর হ্যাঁ না করে না। বুড়ী ডেকে ডেকে নেতিয়ে পড়ে। 'বাবা, ঘুমিছ !'

রাত কতটা আন্দাজ করতে পারছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেগী উঠে দাঁড়াল। ইন্দরের কাপড়টা একটু টেনে দিলো। কানাই-ডুমের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিলো। সব্বার মুখ দেখা যাচ্ছিল।

আবছা আলোয় কেমন ভাল লাগছিল মুহূর্তের জন্য। মেগীর মনে হচ্ছিল সে যেন এই মোহগ্রস্ত পরিবেশে একা জেগে থেকে হেনস্তা করছে সবাইকে।

বেড়ার ঘরে কঞ্চির জানালার থলি লাগানো গোঁজাটা খুলে দিলে। ক'টা বাজে বোঝা যাচ্ছে না। বাইরেটা নিকষ কালো অন্ধকার। বাপ্‌রে এরকম অন্ধকার বুঝি কেউ দেখেনি।

গোপ্তা খাওয়া ইন্দরকে আর একবার ডাকল মেগী। 'এই শুনছ।' ইন্দর পাশ ফিরল। 'এই উঠো না। ভাঁটি ধরাবেনি ?'

'ধুর মাগী, ঘুমা!' ফোঁস ঝাড়লো ইন্দর। ইন্দরের ঘুম এখনো ছাড়েনি। বাইরের অন্ধকারের মতোই গাঢ়।

মেগীর কেমন রাগ হোল।

আগড়টা খুলতে যেতেই ছাগীটা ব্যা করলো। থাক্ থাক্। আগড় খুললো সে।

বাপ্‌রে এক রাশিকৃত আলকাতরা কেউ ঢেলে দিয়ে গেছে যেন। দূরে, অনেক দূরে চরাকুণ্ডু মাঠের বিলখোপের হোগলার ভেতর থেকে যেন দুটো শেয়াল মজা করে হেঁকে উঠলো। শেয়ালের শব্দ শুনে কালীতলার তিনটে কুকুর একই সঙ্গে চীৎকার করল। গভীর রাতে নিশুতির আমেজ কাটিয়ে মড়াচির ভাগাড় বিলখোপ ডিঙিয়ে অনেক দূরের আকাশের সীমানা বরাবর এক আকাশ নক্ষত্র খুঁজে পেতেই কেমন সাহস হোল মেগীর। ঐ তো ওনারা আছেন। পিত্তিপুরুষ বাপ-শ্বশুর-মামা এই সব।

গেলবারে অনেক টাকা ক্ষয়ক্ষতি দিতে হয়েছে। সেই টাকা উসুল করা এখনো যায়নি। সুতরাং উসুল তো করতেই হবে। কি আর রোজগার! বেনেদের পচা গুড় আর নিশাদলের টাকা মিটিয়ে যা থাকে তাতে জ্বালুন কিনে ফতুর হতে হয়। সংসারের ছেলেপুলের মুখে দু'হাতা গরম ভাত তুলে দিতেও কুলোয় না। কুলোবেই বা কি করে? সকলকে পুজা দিতে দিতেই ফুরিয়ে যায়।

সেই ঘন কৃষ্ণ রাতে কানাইডুম বের করে এনে গুড়ের জাওয়া থেকে পচা গুড় তুলে মেগী ভাঁটিতে চাপালো। রাত থাকতে থাকতে

সে ভাঁটি নির্ভিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। মেগীরও ভাল লাগে না। যে কাজ সহজভাবে মাথা উঁচু করে করা যায় না সেই কাজই তাকে করতে হয়। তার অপরাধ তার এই কাজে পেট চলে। পেট চালায়।

তালপাতা, আশুথডাল, বাঁশ কঞ্চি, বাঁশবনের শুকনো পাতা, বুনো গাছের শুকনো ডালপালা এই সব নিয়ে ভাঁটি জ্বাল্লো মেগী। জাওয়ার পচা মাল এখন গরম হয়ে ফুটতে থাকলো। গরম বাতাস বকযন্ত্রের মতোই রোলা বাঁশের নল দিয়ে টোসা বেঁধে পড়তে লাগলো। জমতে লাগলো নির্দিষ্ট বোতলে। ঠস্। ঠস্। প্রথম প্রথম একটা বিদঘুটে গন্ধে মাথা ঘুরে যেতো মেগীর। এখন আর মাথা ঘুরে না। বরং ঘুরিয়ে দেয় লোকের। পাঁচ বোতল পুরণ হতে আর একটু বাকী। সমস্ত পাড়া অচৈতন্য। কালো রাত্রির কপাল চিরে মেগী যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। তার কোলের ছেলেটা কেঁদে ফেলতেই সে ছুটে গিয়ে তাকে বুকে নিয়ে ফিরে এলো। 'আহা বাছা!' তাদেরকে বাঁচাবার জন্যেই কী ভীষণ আর্তনাদ তার। এত করেও দু'কেজি গুড় পচিয়ে সব দিয়ে-থুয়ে পাবে মাত্র পাঁচ টাকা।

হঠাৎ কি-একটা গাড়ির শব্দ পেলো যেন। দূরে। না, অন্য কিছু। এত রাতে এই গাঁয়ে গাড়ি! চন্‌মন্ করলে মেগী। ছেলেটা বাদুড়-ঝোলা হয়ে মেগীর মাই ঝুনছে। ছেলেটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে আন্দাজ করতে থাকলো কিছু ব্যাপার কিনা।

না, কিছু নেই। কোন শব্দ নেই। স্বরীর ঘরের দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল একটা লম্ফ এপাশ ওপাশ করলো। একটু গজ্ গজ্ কানে বাজলো।

বাপ্‌রে এত রাতেও ওরা জেগে গজ্ গজ্ করছে। রাত্রি বারোটার পর ওদের বকুলতলার পাশ দিয়ে ব্যাম্ভদাত্যি পাঁঠার গন্ধ ছড়িয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে চটাং চটাং চলে যায়। অনেক পর নিজের কানে শুনেছে মেগী। ওদের সাহসকে বলিহারী দেয় সে। এই সব ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায়। হঠাৎ কী মনে করে আকাশের দিকে তাকাতেই একটা নক্ষত্র, জ্বলজ্বলে নক্ষত্র তাকে ভাল লেগে যায়।

কত কী প্রশ্ন জেগে ওঠে। মাহিষ্যপাড়ার ছেলেরা, বামুনপাড়ার ছেলেরা স্কুলে গেলে মন কেমন করে। তার ছেলেকেও স্কুলে পাঠাবে কিন্তু কিছুতেই তাকে পাঠাতে পারে না। হায় কী করেই পারে! পাঁচ বোতল মাল বিক্রী করে ইল্লী দিল্লী জেতা যায় না। বড়জোর জনতা শাড়ী কেনা চলতে পারে।

'ইন্দর বাড়ি আছিস্?' ইন্দর—একটা অচেনা স্বর। এত রাতে। কে হতে পারে? কিছু বলবার আগেই তিন-চারজন পুলিশ আর কয়েকজন পাড়ার নেতা ঘিরে ফেলেছে তাকে।

মেগী হতভম্ব হয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে বুকে বল পায় পুলিশ দেখে। না, ডাকাত নয়। নির্লিপ্ত ভাবে জিগ্যেস করে, 'কী ব্যাপার? এত রাতে কেন আপনিরা?' এই বলে ভাঁটিতে জ্বাল দিতে লাগলো।

সঙ্গে থাকা মুখ্যাটি বললে, 'মেগী—ইন্দরের বউ মেগী।' তাদেরই মধ্যে একজন প্রায় বয়স্ক গেঁড়া লোক বললে, 'ইন্দর মদ বন্ধ করতে চায় কিন্তু এই মাগীটা হারামজাদী। একে মাল কর্ত্তেই হবে। আপনি এর ব্যবস্থা একটা করুন।' বেশ গাঁট্টাগোট্টা একটা পুলিশ অন্য একজন পুলিশকে বললে, 'এই যাও এর ঘর সার্চ করো।' লোকটা সম্ভবত দারোগা। ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। লাটসাহেবের মেজাজে বললে—'এই কে আছ দরজা খোল।' ধমকালো। অথচ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না। আরো দু-একবার ডাকতেই বিরক্তি ভরেই ঘুমের ঘোরে ইন্দর সাড়া দিলে—'কে রে মাল নেই। যা। পালা।' পুলিশ আরো ধমক দিলো।

তড়াস করে দরজা খুলেই ভয়ে জোড় হয়ে গেল। চোখ রগড়ালো। হাই ভাঙলো। আ হা…

'অ্যাই মাল কোথা বের কর।'

'ঐ তো ভাঁটিতে তৈরী হচ্ছে। ঘরে তো কোন মাল নেই।' ঘরের ছেলেগুলো উঠে পড়েছিল। কথাবার্তায় তারাও অন্ধকারে হাড় কাঁপানো শীতে কুঁকড়ে যাওয়া কুত্তার মতো এককোণে জড়ো হয়ে গেছিল।

তিনজনে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ছিল। মেজ মেয়েটা মালের ব্লাডারটায় হাত পড়তেই ফিস ফিস করে বললে, 'দিদি, এই তো মাল। বাপ বলছে কেন নেই বলে। বাবুকে বলি? বাবু…'

ডাকবার আগেই মুখটা চেপে ধরে দিদি। বলে দিতে পারে, তাই ভয় পায়।

ছেঁচা বাঁশের তৈরী দরজাটায় পুলিশটা মুখ গলাতেই ভুর ভুর গন্ধ ছাড়লো। ছাগলের পেচ্ছাব, মদের জাওয়ায় পচা গুড়ের গন্ধ, এতগুলো মানুষের নিশ্বাস, কানাইডুমের শিস্ সবে মিলে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ছ্যাঃ, কোন মানুষ থাকে!

থু করলো সে। তারপর সেণ্ট-দেওয়া রুমালটা হাতে চেপে হাতে লাইট নিয়ে খুঁজতে লাগলো মদ—অনেক মদ।

ছেলেগুলো বসে ছিল ব্লাডারের উপর। চটাস্ করে থাপ্পড় দিয়ে সরিয়ে দিতেই ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে সরে গেল। ব্লাডার দুটো কাড়িয়ে নিল হাত থেকে।

'স্যার পেইচি। দুটো ব্লাডার।' তল্লাসী করা পুলিশটি বলতেই মদনা বললে, 'দেখছেন স্যার, মাগী তবু সন্ধেবেলা এক গেলাস দিলনি।' 'বিনা পয়সায় কে ওকে দৈনিক মাল দেবে, বাবু। উনি রিলিফ ডাইডোল দেবে বলে দৈনিক মাল দোব কুথেকে? ডঙ্গাপেটো, মুখপোড়া।' দারোগাবাবু ধমকে দিতেই মেগী থেমে গেল।

ইন্দরের মা অন্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে তার গায়ে একটা কী যেন ঠাণ্ডা মতো লাগলো। ভাবলো এটাও একটা ব্লাডার। অন্ধকার ঘরখানা তার মনে হচ্ছিল মহা কবর। আলো নেই। অন্ধকার। হিম। পুলিশ এসেছে বুঝতে পেরেই খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর নুড়ি-কাঁথাটা টেনে ঢাকা দিল। বুড়ীর মনে হোল, পুলিশের ভয়েই বোধ হয় ইন্দর এদিকে রেখে দিয়েছে। অবশ্য পুলিশ ইচ্ছে করেই বুড়ীর দিকে আসেনি। আসবেই বা কেন। তার আগেই সব মাল তো তারা পেয়ে গেছে। কাঁথাটা চাপা দিতে গিয়ে মনে হোল পিঁড়ি পাকানো। তবুও সে কাউকে কিছুই বলল না।

পুলিশ ভাঙতে লাগলো। ভাঙলো। জাওয়া ভাঙা হোল। ভাঁটিতে জল ঢেলে দিল একজন। সেই ভোর রাতে শব্দ হচ্ছিল। গুম। গুম। মেগীর মনে হচ্ছিল চীৎকার করে কাঁদে। কিন্তু কাঁদতে পারছিল না।

মদন বললে, 'এদের ভীষণ বাড়াবিস্তর তেজ. বাবু। চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিন।'

মেগী তার রাগ সামলাতে পারছিল না। দাঁতে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। সে বলেই ফেলল, 'মদন কাকা, তোমাদের তো আমার উপর খুব রাগ হবেই। কেননা বিনি পয়সায় মদ খাওয়াইনি আমি। খালি পেটে মদ খাবে একটা কাঁচা লঙ্কা জিভে ঠেকিয়ে, না হলে এক সোটা তেঁতুল দিয়ে। দিইনি বলে রাগ তো হবেই। তুমি তো আবার নেতা। নেতার মরণ!'

দারোগাকে বললো, 'দারোগাবাবু! তোমরা ওলাউঠো ভাঙছো ভাঙো। তোমরা পুজাও নেবে আবার সর্বনাশও করবে। এমনটা না করলেই পারো। সেবারই তো তোমরা যখন বারোশ টাকা নিলে তখন তো আমাকে বললে, দূর মাগী আমরা যাব খালি হাঁড়ি ভাঙরো। ধরে আনবো। রাস্তার মাঝখানে টাকা দিবি ছেড়ে দোব। বলেছিলে নয়, তোরা এসব না করলে দুটো পয়সা কোত্থেকে পাব। আমাদের মাগ ছেলে কোত্থেকে প্রতিপালন করব। আর পাঁচ দশ দিন যেতে না যেতেই এসব ন্যাকামির কি মানে গো বাবু?'

এত সব কথার ফাঁকে ইন্দর কোথা চলে গেল কেউ বুঝতে পারলো না। আলো-আঁধারির মাঝখানে মেগীর দেহ থেকে একটা অদ্ভুত জ্যোতি সবাইকে মুগ্ধ করছিল। তাদের বিবেকবোধ একবার যেন মাথা নীচু করল। কেউ কোন উত্তর দিচ্ছিল না। দারোগাবাবু হাসিমুখে শুনছিল সব কথা। কেননা গতবারে সে নিজে আসেনি।

মেগী দারোগাবাবুকে অভিযোগ করলো, 'বাবু, মদ করি, মার দাও, টাকা নাও, সব ভেঙে তছনচ্ করো ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এই নেতা মদন কাকা যখন গেল রোববার আমার ঘরে একটামাত্র পেঁয়াজ দিয়ে দু'গেলাস খেয়ে বললো, মেগী, একবার দিবি, তখন আমি ঠিক

থাকতে পারিনি। উনুনের জ্বাল-ঠেলা নুড়োটা দিয়ে সপাং করে ঠেঙিয়েছিলুম। তুমি দেখো দারোগাবাবু, ওর শরীরে তার দাগ আছে। তারপর থেকে ওরা সবাই আমার পেছনে লেগেছে।' মদনার সঙ্গে একজন তিরিশ-বত্রিশ বছরের জোয়ান ছেলে মেগীর কথায় প্রতিবাদ করতেই মেগী ফুঁসে বললে, 'চুপ কর মাতালের বেটা, বাপকে বন্ধ করতে পারিসনি। তোদের গোমস্তা, তোদের মাস্টার, সমিতির চিয়ারম্যানবাবু তারা কুন লজ্জায় মদ খেতে আসে। তোদের লজ্জা পায়নি?'

দারোগা এবার ধমক না দিয়ে পারলো না। বললে, 'চল্ থানায় চল্।' মুহূর্তের মধ্যে মেগী তুমি থেকে তুই-এ নেমে এলো। সব তো গেছে এরাই তো সব কেড়ে খায় তাই তোয়াক্কা কাদের। রেগে লাল হয়ে মেগী বললো, 'দূর গুরবেটা, তোর চোখ রাঙানি থামা। চল্ তোর সঙ্গে আমরা সবাই থানায় যাব। মদ তৈরী না করলে সেই উপোস খেতে হবে। ঠিক আছে তাই চল্। তিনটে ছেনা নিয়ে রানীর মতো থাকবো। বাইরে উপোস যাওয়ার চেয়ে জেলখানার ঘানি টানার ভাত অনেক ভাল।'

মেগী সেই প্রায় কাক-ভোর রাতের ভিজে ভাদরের আবহাওয়ায় ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। কয়েকজনে মিলে হাঁড়িকুঁড়ি, ব্লাডার ভর্তি মদটা বইতে লাগলো গাড়ির দিকে।

মদনা একজন কনস্টেবলকে আস্তে আস্তে বললে, 'একটা ব্লাডার থাক-না স্যার!' কনস্টেবলটি শুধু একবার তাকাল মদনার দিকে। সে কিছুই বললো না।

সত্যিই ওরা কোথা যাচ্ছে—যাবার আগেই ইঁদুরের মা উঠে এসেছিল ধুঁকতে ধুঁকতে। এতক্ষণ কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। কেউই না।

সে পুলিশের উদ্দেশ্যে বললো, 'বাবা তোমরা তো সবই নিয়ে যাচ্ছো—আমি আর থাকি কেন? আমাকেও নিয়ে যাও।'

একজন পুলিশ বলল 'আপনি থাকুন। আপনি কোথা যাবেন?' বুড়ী এসব শুনতে পেল না। চোখ মুছল। বললো, 'বাবা, আর

একটা ব্লাডার আমার ঘরে আছে, নিবেনি ?' রাইফেল-ধারী বললে, 'তাই নাকি ? চলো, বের করে দেবে।'

বুড়ী খুব ধীরে হেঁটে গেল। যেখানটায় বুড়ী কাঁথা টেনে লুকিয়ে রেখেছিল সেই ঠাণ্ডা পিঁড়ি-পাকানো জিনিসটাকে ব্লাডার মনে করেই পুলিশকে বললে, 'বাবা, আলোটা দেখা, বড্ড অন্ধকার। আমি বের করে দিচ্চি।'

বড় লাইটের আলোয় সারা ঘরখানি ঝলমলিয়ে উঠল। বুড়ী যেন ইহজন্মে এই ঘরে এত আলো কোনদিন দেখেনি। পুলিশ বললে, 'দেখতে পাচ্ছো—।'

বুড়ী বলে চললো 'এইখানে, এইখানে, এ যে এই ব্লাডারটা নিয়ে যাও বাবা।' বলতে বলতে কাঁথাগুলো সরিয়ে চাটাইটা দিতেই মস্ত একটা গেঁড়িভাঙা সাপ ফোঁস করে বুড়ীর পায়ে চটিয়ে দিল। পুলিশ চীৎকার করে দু-পাউঁড় পিছিয়ে আলো ধরে রাখতেই ছুটে এলো অন্যরা। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মারবার আগেই সাপটি গা-ঢাকা দিল। পাওয়া গেল না। ততক্ষণে বুড়ী অজ্ঞান হয়ে গেছে।

পুলিশের কালো ভ্যানটা হর্ন বাজালো। ক্ষিপ্রগতিতে ওরা সবাই ধরাধরি করে অজ্ঞান বুড়ীকে ভ্যানে চড়িয়ে দিলে। হাসপাতালে দেবে। চার সন্তানকে ঠেলে নিয়ে মেগী চড়ে বসলো ভ্যানে। হর্ন বাজিয়ে গাড়ি চলে গেল তাদের ভিটে-মাটি পেছন করে।

ওরা চলে যেতে ইন্দর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এলো উঠোনে! ধোঁয়া মদ আর মৃত্যুর মাদকতায় কেমন বধির হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে তা কাটিয়ে উঠতে চাইল প্রাণপণে। কেবলমাত্র তবুও কেমন এক অসহায়তা তাকে ঘিরে ফেলল। সে সেই অন্ধকারের ভিতর লুঙ্গির খুঁট মুখে চেপে ককিয়ে উঠলো, 'মা গো—আমি এ চাইনি, তুই বিশ্বাস কর।'

কাটারি

গতবছর রথের মেলায় বৌ-এর নাককড়াইটা বন্ধক দিয়ে সাত টাকা মূল্যে খগেন কামারের চাটা থেকে কাটারিটা কিনেছিল গগনচন্দ্র। আজ দু'তিন দিন কিছুতেই কাটারিটা খুঁজে পাচ্ছে না। রাগে সন্দেহে ক্ষোভে গগনচন্দ্র মাথার ঠিক রাখতে পারছিল না। এমনিতেই সংসারে অভাব। তবুও আজ মিছিলে যাবার জন্য পতাকার বাতা তৈরী করার সময় রাস্তায় ফেলে গেছিল কাটারিটা। কে নিয়েছে খোঁজ পাচ্ছে না। রাস্তা মানে রূপনারাণের পাড়। পূবদিকে হুগলীর গ্রাম বুক উঁচু করে ফসল ফলিয়েছে। ঐ ফসলের মাঝখানে নদীর ধারে মেয়েটিকে পোড়ানো হোল। গ্রাম-শহরে এখন মেয়ে-পোড়ানো একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রতিবাদ করতে তারা মিছিল করবে বলে বাতা তৈরী করছিল।

এই ব্যস্ত রাস্তায় মালকোচা মেরে গগনচন্দ্র খেউড় করে চলেছে। তার কাটারি সে আদায় করবেই। 'দেখি কুন বাপের বেটা হজম করতে পারে।' কামারশালে কথাটা কানে যেতেই শ্যাম মণ্ডল বেরিয়ে এলো। জিগ্যেস করলো গগনকে। তারপর শ্যাম মণ্ডল কামারশালা থেকে একটা কাটারি এনে বললো, 'এটা কার দেখ তো?' গগনচন্দ্র শ্যামের চেয়ে বয়েসে ছোটই।

'আরে, এটাই তো খুঁজছি' বলেই চীৎকার করে ডাকলো, 'অ্যাই, অ্যাই দেখ দেখ আমার কাটারিটা পেয়েছি। তাই বল, শালা মিছিলের কাটারি চুরি যাবে?' হাসিমুখে গম্ গম্ করতে করতে নদীর চড়ার দিকে নেমে গেল গগনচন্দ্র।

নদীর চড়ার ভেতর একটা শিরীষগাছ। বেশ ছাওয়া। ঘন পাতলা। দৈনিক বিনে পয়সায় খায়, আজ নেদো ময়রার দোকান থেকে বিস্টু মাস্টার ঝালশুঁটি এনেছে। বঁচু কেত্তন খোল-কত্তাল

পাশে ফেলে রেখে বলে, 'দাও হে নেড়াবাবু দুগেলাস দাও দিখিনি খাই'—বলেই বসে পড়ে ঢক্ ঢক্ করে তাড়ি গিলতে লাগল। একে একে এই আড্ডায় সবাই জমেছে—পাড়ার নেতা, তোষামোদে, ধর্মাবতার, মিথ্যেবাদী যুধিষ্ঠির প্রায় ছ'আটজন লোক তাড়ি চিবোচ্ছে। একটু ঝালশুঁটি, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, চানাচুর এইসব নিয়ে বেলা বারোটার রোদে রূপনারাণের হাওয়ায় জমে উঠেছিল আনন্দের সুগন্ধ।

গগনচন্দ্র বিস্টু মাস্টারকে বললে, 'দেখুন আপনাদের মিছিলে গেলুম আর শ্যাম মণ্ডল আমার কাটারি চুরি করল। শালা গোসাপ। গেল নির্বাচনে আমাদের কাঁদিয়ে এবার শালা কাটারি চুরি করতে লেগেছে।' বঁচু কেত্তন বললে, 'ওঃ, শ্যামার খুব গরম। ওকে একটু সাবুদানা দাও দিকি।' বলেই শেষ ঢোক টানল। বিস্টু মাস্টার ভাল করেই জানে, গগনের অভিযোগটা মিথ্যে। শ্যাম আমাদেরই লোক। কিন্তু এই সুযোগ। স্কুলে না যেতে পারলে শ্যামা তার পেছনে খুচ্ খুচ্ করে। ওকে একটু টাইট করা দরকার। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে বললে, 'যা যা ওসব বাদ দে।' শয়তানি চাগাড় দিয়ে উঠলো তার মাথায়। নেদো ময়রার পাশের লোক বিধু বললে 'বাদ দাও, এসবে দেশ এগোয়নি।'

আস্তে করে বিস্টু মাস্টার বললে, 'কিছু দেখা দরকার বৈকি। দে ছেড়ে দে'। গগনচন্দ্র সব সময় মিছিল করে। জনমজুর খাটতে পারে না। দেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়ে জিআর. পায়। ঘরের ছেলে-বৌ কিছু খাক বা না খাক সে সবসময়ের কর্মী। সে বললে, 'তা হবেনি। এর একটা বিহিত কত্তে হবেই।'

শ্যাম মণ্ডল গগনের এই অস্বাভাবিক আচবণে হেসে ফেলেছিল। সে বুঝতে পারেনি। পরের দিন সকালবেলায় দেখলো দরজার সামনে পোস্টার সাঁটা আছে ঃ "কাটারি চোর শ্যাম মণ্ডলের বিচার চাই। কাটারি নিয়ে মিছিল বন্ধ করা যায় না যাবে না। কাটারি খেকো কুত্তারা হুঁশিয়ার।" পোস্টার পড়ে চমকে গেল শ্যাম। রাস্তায় দেখলো কয়েকটা একই পোস্টার। কেমন ভয় হোল তার। সেও তো

গরীব মানুষ। কাটারি সে চুরি করেনি। রাস্তায় কে বা কারা ফেলে গিয়েছিল। সে তুলে এনেছে। চুরি করার ইচ্ছে থাকলে সে তো তার শালে ঘা মেরে বদলে নিতে পারতো। যা বাব্বা!

প্রতিবেশীরাও বুঝতে পারলো না কী হচ্ছে। মুদী দোকানী বললো 'শ্যামদা দিন ভাল নয়। তুমি ওদের সাথে কথা বলো।' শ্যাম ভাবলো বয়ে গ্যাছে। কেন যাবে? বলবে না

দিন গড়িয়ে কখন রাত আটটা বেজে গেছে সারাদিনই সে নিজের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করেছে।

—'শ্যামবাবু বাড়ি আছেন?'

—'কে গো?' শ্যাম বললো।

—'আটচালায় ডাকছে আপনাকে। গগনের কাটারি নিয়ে মিটিং হবে।' ছোকরাটি বললো।

—'মিটিং! আমি জানিনে অথচ রাতে ডাকা হচ্ছে—।' বলেই বেরিয়ে এলো শ্যাম। বললে 'আমি যাব না।'

—'তোর বাপ যাবে।' ক্যাঁৎ করে লাথি মেরে দিলো ছোকরা। একুশ-বাইশ বছর বয়েস হবে তার। শ্যাম না না করেও আটত্রিশ পার করে ফেলেছে। 'চল্ শালা।'

চুলের ঝুঁটি ধরলো আলাদীন। 'কাটারি নেবার বাই মেটাবো।' এতক্ষণে শ্যামের বুড়ো বাপটা হৈ হৈ করে এসে গেছে। শ্যামের মা চীৎকার শুরু করেছে। ভাগ্যিস্ বৌ ক-দিন বাড়িতে নেই। থাকলে কি হোত কে জানে। ঠাস্ করে কান-মুথোয় চড়িয়ে দিলো। মুরগী যেমন ঘাড় লটকে পড়ে তেমনি করে শ্যাম ঘুরে পড়লো। সারাদিন কামারশালের আগুন। খরার আগুন। সংসারের অনটন। হায়-হায় তার উপর মিথ্যে অত্যাচার।

দু'বার চোখে জলের ছিটা মারতেই জ্ঞান ফিরলো। 'শালা ন্যাক্ড়া! ছেপোমী। দাঁড়া। এই ধর। চাগি নে।' বলেই চাগিয়ে নিলে ছেলেরা।

প্রতিবেশীরা এলো প্রতিবাদ করতে। কিন্তু ফল হোল না। আটচালায় অন্তত পঞ্চাশজন লোক। একদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

লক্ষ্মীকান্তবাবু তার ক্ষমতা মতো বিশ্লেষণ করেই বললো, 'শ্যাম আমাদের দেশের ছেলে, যা হবার হয়েছে, ক্ষমা করে দাও। আর, এক হাজার এক টাকা জরিমানা করে দায়মুক্ত করে দাও। কি শ্যাম, রাজী আছ?' শ্যাম যেন ভিরমী দেখলো। তার কোন কথা শোনাও যেন কারুর দরকার নেই।

লীলাবুন্দি কলেজে পড়ে। সে বললো, 'এটা কি বাহাত্তর সাল? এ কেমন আলোচনা?'

· ····রে রে করে উঠলো মানুষের দল। লীলা দেখলো এরা যেন জিআর. রিলিফ আর চাকরীর লিস্ট নিয়ে চেঁচাচ্ছে। এরা কেউ শ্যাম মণ্ডলের প্রতিবেশী নয়। লীলা একা চুপ করলো। শ্যাম লজ্জায় ক্ষেপে অপমানে বললো, 'না, পারব না।'

গগন বললো 'তোর বাপ পারবে! কাটারি চুরি? অ্যা, শালা কুত্তা।'

—'কুত্তা তো হবোই—ধারের টাকা শোধ চাইলেই কুত্তা।' শ্যাম শান্ত গলায় বললো। তার কষ্ট হচ্ছিল খুব।

হঠাৎ কিষ্ট মাজীর নাতি এসে চাঁড়িয়ে দিল শ্যামের গালটায়। 'আপনি মিছিল ভাঙবেন?' কে যেন শ্লোগান দিল 'কাটারি নিয়ে মিছিল ভাঙা চলবে না।' 'হুঁশিয়ার।' সবাই চীৎকার করতে লাগলো। একসময় ধোলাই হতে লাগলো শ্যাম-এর উপর। সে এক বীভৎস মার। হাজার টাকার শোধ-বোধ খেলা। চাঁদা তুলে চাঁটি মারার চেয়েও যেন কঠিন অত্যাচার। মার খেয়ে মুতে ফেললো শ্যাম। আটচালার মানুষগুলি হো হো করে হাসছিল।

ওপারে তখন টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছিল। আলো। ওখানের ঘাসেও লেগেছিল কাঠফড়িং-এর রক্ত। শুধু রূপনারাণের বাতাসে গরম ছিল না। চিরকালের অবসাদ ভাঙানো হাওয়ায় ঘুম ধরছিল বা কারো। তবুও হয়রান অত্যাচার অপমানে পোড় খাওয়া পুরানো কর্মী নগেন কাকা থেমে থাকতে পারেনি। কিস্টু মাস্টারের দলবাজীর মতলবকে ফাঁস করে দিয়ে শ্যামকে বললো, 'উঠ্ আমার সঙ্গে ঘর চল্।' সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কেউ রা কাড়লো না।

নাকের রক্ত মুছে শ্যাম বললো, 'না, ওরা মারবে।'

নগেন কাকা বললে, 'আবার রক্ত মুছে উঠে দাঁড়াতে হবে। ওদের ঘাড়ে পা দিয়ে গট্ গট্ করে হেঁটে যেতে হবে।'

শ্যাম বললো, 'যদি আবার মারে।'

নগেন কাকা বললো, 'ফের উঠতে হবে।'

শ্যাম বললো, 'আবার যদি··'

নগেন কাকা বললে, 'আবার।' শ্যামের হাত ধরে আটচালার বাইরে এলো নগেন কাকা। হাতে একটা শক্ত লাঠি

আলাদীন বললো, 'খবরদার, এগোবেন না।'

সত্তর বছরের বুড়ো আঠারো বছরের জোয়ানের মতো ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'বাপের বেটা হলে এগিয়ে আয়।' ফিরে দাঁড়ালো নগেন কাকা।

ফাঁস

গতকাল বিকেলে মহাজন দু'মন পিতল পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে পরশুদিন মাল পাঠাতেই হবে। গয়ারাম তাই তার বড় ছেলে অশোককে শহরে পাঠালো সেই সকালেই। 'যা, দু'মন কয়লা আন। খুব শিগ্‌গীর করবি। দুপুরে ভাত খেয়েই শাল ধরাবো।'

অশোক তাই সকালেই কয়লা আনতে গেছে।

শীতলাপুজা হবে বলে একদল লোক এসেছিল চাঁদা নিতে। গতবছরের মতো এবছরেও আট টাকা চাঁদা পড়েছে গয়ারামের। গয়ারাম বললো, 'একটু কম করলে হোত না?' দু'এক কথার পর তারপর সে সব টাকাটা ওদের দিয়ে দিলো।

দলের একটা চ্যাংড়াবয়সী ছেলে গয়ারামকে কাকা বলে। সে বললো, 'খুড়ো আজ সন্ধ্যায় যাবে। বনু গাছের রস ভারী খেলছে। যেতেই হবে।' গয়ারাম বললো, 'ঠিক আছে।' তখনই সে মনে মনে ঠিক করলো ঢালা নেমে গেলে হরেকিষ্টর দোকান থেকে চানাচুর কিনে নিয়ে যাবে। যাক রাত্তিটা ভাল কাটবে তার।

গয়ারাম এমনিতে ফুর্তিবাজ লোক। বেশ ভালই। লোকজন সখ আহ্লাদ বেশ ভালই আছে। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি তো ভাল নেই। তাই সে সবসময় পেরে ওঠে না। জমি-জিরেত তেমন কিছু নেই। কিছু জমি ভাগে করত। তাও আবার সব ফিরিয়ে নিয়েছে। চরাকুড়ের মাঠে মাত্র দশ কাঠা জমি। তাতেই সবাই চাষবাস করতে যায়। সে খুব বেশী লেখাপড়া শেখেনি। খুব ছোটবেলায় তার বাপ মন্মথ গেছে মরে। কে আর পড়ায়। তিনটি ছেলে নিয়ে মা পৃথক হয়েছিল জেঠুর সংসার থেকে। জেঠু মস্ত লোক। খারাপ নয়। কিন্তু যে-যার ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত। তবুও তার মা কোটা-ভানা করে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে তুলেছিল তাদের।

তালপুকুরের পাঠশালায় তখন আচার্যি মাস্টার পড়াতো। না পড়লে বেধড়ক ঠেঙাত। গয়ারাম খুব পচাল করতো তখন। মাস্টারকে সে বলতো, আচার্যি ঃ বামুন ছেনা, বেত মারলে আর যাব না। তার মা খুব গালাগালি করেছিল মাস্টারকে। সত্যিই তো কত কষ্ট করে সে তার ছেলেপিলেদের খাওয়ায়। মাস্টারের বাপের তো খায়নি। তবে সে বেত মারবে কেন !

সুতরাং গয়ারামের আর পাঠশালা যাওয়া হোল না। তখনের সরকার তো আর পড়াশোনা চায়নি। তাই মাস্টারদেরও বেতন নেই পড়াশোনার রেওয়াজ নেই।

গয়ারাম বিড়ি খেতে শিখলো। গয়ারাম কয়েৎ বেল চুরি করতে লাগলো। ডাকপাখীর কল বাঁশবনে পুকুরধারে এঁড়ে ডাকপাখী শিকার করতে লাগলো। শামখোল ধরবার জন্যে ঢিল নিয়ে পিছু পিছু ছুটলো। কত কি করে বিড়ি তামাক নেশা ভাং এই সবে গোল্লায় যেতে যেতে পাড়ারই এক প্রতিবেশীর পাল্লায় পড়ে কারখানার কাজ শিখে গয়ারাম আজ ত্রিশ বছর কারবার চালাচ্ছে।

গয়ারামের খুব মনে আছে বিধান রায়ের আমলে কারবার চট্ হয়ে গেছলো। এ তল্লাটের এই শিল্প তো একশো বছরেরও বেশী পুরানো। গয়ারাম এসব জানে,—ওপাশের কামার দালাল চোংদার এদের মাল পাকিস্তানে প্রচুর চালান যেতো। দেশ-ভাগের পর কত পিতল এদের বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলো। পূর্ববঙ্গ দিলো না। তখন এ গাঁয়ে প্রতিদিন কত সখ আহ্লাদ নৃত্য। কী আনন্দ তখন ! কারখানার আওয়াজ হতো সারাদিন সারারাত। গভীর রাত তখন ছিল না নিশুতি। কেউ না কেউ গায়ে গতরে খাটছে। বৌ খাটছে। মা খাটছে। মেয়ে-ছেলে সবাই প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। লাভ ছিল না। কাজ ছিল।

একদিন কলকাতার বিদ্বানরা হিসেব করে শিখিয়ে দিয়েছিল সিলভারের দু'নয়াপয়সা গালাই করতে। শয়ে শয়ে মন পয়সা গালাই হয়ে গেছে। সরকার কোনদিন এদের দিকে নজর দেয়নি। মরা-হাজায় খরায় লোকগুলো কেমন করে বাঁচে কারো প্রয়োজনও

হয়নি তখন। নিজেরা যেমন ভেবেছে তেমন করেই বেঁচেছে।

গয়ারামের কারখানা এখন ভালই চলে। সংসারের সবাই খাটে, বাড়তি পয়সাটা রয়ে যায়। পয়সা মাত্র কুঁদিয়া আর টানিয়াকে দেয়। সংসারের দশ-বারোটা লোক সবাই ঘরে কাজ পায়। সবারই মজুরী থাকে। বাইরে কাউকে যেতে হয় না। আর সবাই তো বাইরে যেতেও পারে না। পারবেই বা কেন। পারাটা জরুরী নয় তাই যেটুকু বাণী সেটুকুও থাকে। আগে টুট্ পেতো না। এখন পায়। মনে পাঁচ সের টুট্ পায়। চলে যায়।

গয়ারাম তাই দৈনিক তার ইষ্টদেবতাকে গড় করে। মহাজনকে গুরুর মতো ভক্তি করে। আর যাই হোক সে তো মহাজন।

মুখ্য মানেই বুঝতে হবে আদ্‌দামড়ার অধম। সে যা বুঝবে কারুর বাপের ক্ষমতা নেই কিছু বুঝায়। মখ্যুর গোঁজ সহজে উপড়ায় না। মহাজনের যে অন্য মানে আছে সে তা বুঝতে চায় না। মহাজন মানেই গুরুজন, শ্রেয়জন। সে যে তার সুখ দুঃখ দেখে জন্মান্তরে বিশ্বাসী. সে তাই মহাজন নামের সঙ্গে তার আত্মাকে লেপটে ধরে। এই সুযোগে হেঁতে জোঁকের মতো চুষতে থাকে মহাজন।

গয়ারাম যখন মহাজনের ঘর যায় তখন তাকে মাটিতে বসতে হয়। অনাদর অবহেলা পায়। মহাজন গয়ারামের বাড়িতে এলে তার বিরাট সম্মান। বসতে চৌকি দেয়। জল দিয়ে প্রণাম করে গলায় কোঁচার খুঁট দিয়ে সামনে এসে উবু হয়ে বসে বিনয়ের সঙ্গে কথা শোনে। মিনতি করে। আহ্লাদ করে। ভয়ে জুবুথুবু হয়। বদি চোটে যায়। সিগারেট আনে। সেবা করবার কথা বলে।

মহাজন এসবের মূল্য দেয় না। সে তাড়া দেয় পিতল দিয়েছি বদনা দাও। ধার শোধ করো। কাঁচা মাল শোধ করো। মাল না দিতে পারলে আগে বস্তা টেনে নিয়ে যেতো। এখন তা পারে না। তবে এই মহাজনরা কোনদিন গড়নদারের মেয়েদের দিকে তাকায়নি। এরা টাকা চায়। লাভ বোঝে। এদের সাহায্যও করে গলাও কাটে। এদের বাঁচাবার জন্য শুধু পরিকল্পনা করে না তারা।

অশোকের ফিরতে দেরী হতে দেখে গয়ারাম রাগে গরগর করছিল। বৌমাকে শুনিয়ে দিলো সে যেন অশোককে জানিয়ে দেয় কাজের সময় কাজ না করলে যে-যার দেখে খায় যেন। কারখানার অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজে।

অশোক যখন ফিরল তখন বেলা প্রায় বারোটা। ঠা ঠা রোদে কাঠ হয়ে গেছে ছেলেটা। গেঞ্জী জামায় কয়লার কালি। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। ভীষণ বিরক্ত আর বিব্রত উত্তেজিত বলে মনে হলো অশোককে। কিন্তু গয়ারাম এসব কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। সে অশোকের অসুবিধার কথা না বুঝেই বললে বানচোত এত দেরী হোল কেন।

পাথরে কাঁচের গেলাস পড়লে যেমন ভেঙে চৌচির হয়ে যায় ঠিক তেমন করে অশোক ভয়ংকর ক্রোধে চীৎকার করে উঠলো, 'শুয়ারের বাচ্চা পুলিশকে বলো না গে যাও আমাকে বানচোত বলছো কেন। তাদের বাপেরা খাওয়ায়নি পরায়নি অথচ আমাদেরকে ঝ্যামেলা করে। কারখানার জন্য একমণ কয়লা আনছি বলে জোর করে সাত টাকা কেড়ে নিল ফাঁড়ীর ভেতর থেকে। শালাদের কি গলার তেজ। জমিদারী। মাসমাইনের বেতন নেবে আবার ঘুষও দিতে হবে। কেন দোব ঐ বাজে লোকদের। সেই সকাল থেকে মাথা ঘুরছে খিদেয় শালারা তবু ফাঁড়ীতে আটকে রেখেছিল। যেমন শালার সরকার তেমন শালা পুলিশ। যাও না বেশতো প্রধানের ভক্ত তুমি। যাও দেখি পয়সাগুলো আনো দেখি। একটা লম্বা পুলিশ আমাকে চড় মারলো--'বলেই আরো কুসিতভাবে গালাগালি করতে লাগলো সে। গয়ারাম কিছু বলতে পারলো না। ভয় পেলো। সে না জেনেই অন্যায় করেছে কিন্তু তারও করার কিছু নেই। যদি বিকেল হয়। দু'জ্বাল মাল না করতে পারলে আগামীকাল তো মাল পাঠানো যাবে না।

গয়ারামের বুদ্ধি কম এটা ঠিকই যে কখন কি করতে হয় তা সে জানে না। কেননা সে নিজেও জানে, অশোক তখনো হয়নি

অশোকের আগে যখন পর পর দু'টি মেয়ে হয়েছিল তখন মেজ মেয়েটির বেলায় আঁতুড়ঘরে ঢুকে গয়ারাম তার কাঁচা প্রসূতি বৌকে হালচাবুকে করে ঠেঙিয়েছিল। তার মনে আছে : 'হারামজাদী সবার বেটাছেনা হচ্ছে আর আমার বেলায় শুধু মেইছেনা।' এ তার লজ্জা। সে এখনো ভাবলে দুঃখ পায় এটা সে ঠিক করেনি। পরে বৌ-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল যে শ্বশুরঘরের কাউকে যেন না বলে সে।

আবার গয়ারামের যখন বিয়ে হয়নি তখন যাতে তার শিগগীর বিয়ে হয় সেইজন্যে একদিন সন্ধ্যেয় তাদের গোয়ালের একটা গাইগরুর পা ধরে কেঁদেছিল 'মা ভগবতী আমার বিয়ে দে' ইত্যাদি। এর ফলে মূল্যও দিতে হয়েছিল গয়ারামকে। গাইটি পা ছুঁড়ে মেরেছিল তার গাল বরাবর। গয়ারাম সে দাগ মুছে দিতে পারেনি। তার চোয়ালের নীচে এখনো আছে সে-দাগ কেউ জিগ্যেস করলেই বলে ছোটবেলার দাগ মনে নেই।

তাই বলে গয়ারাম যে বুঝতে পারে না তা নয়। সে সব বুঝতে পারে সরকারের লোকেরা ভীষণ ঘুস খাচ্ছে। সরকারের লোকেরা কাজ করছে না তাদের কারখানা ইদানীং কেউ কেউ দেখতে এলে তাদের ইচ্ছে হয় একখানা বদনা কিনতে। তখন শিল্পীরা ভয়ে দিয়ে দেয়। অশোকের অভিযোগও অবশ্য মিথ্যে নয়। রাস্তার টাকা ঘুরে যাচ্ছিল বলে রাস্তার অফিসারের মুখে সিমেন্ট মাখিয়ে পার্টির লোকজন শাস্তি দিচ্ছে। এটা গয়ারাম নিজে দেখেছে। তার শ্বশুর-ঘরের এক প্রধান অনেক টাকা মেরেছিল বলে তাকে প্রকাশ্যে উলঙ্গ করে বেত মারতে দেখেছে। আব্বাসের মতো নোংরা লোককে তাড়িয়ে দিয়েছে পার্টি। কিন্তু পুলিশ কেন এতো মাতামাতি করে বুঝে উঠতে পারে না সে।

অশোকের মা অশোককে ঠাণ্ডা করে। ঘরে ডেকে নেয়। হাতে মুখে জল দেয়। নুন-চিনির সরবৎ খায় অশোক। তাড়াতাড়ি মুছি জাৎ করতে লেগে পড়ে গয়ারাম। দস্তা সীসা পিতল মিশিয়ে পিতল, সিলভার তৈরি করবে। মাথা ঠাণ্ডা করে ওজন করে

মহাজনের দেওয়া জুৎ মেলাতে ব্যস্ত হয় গয়ারাম। চারিদিকের চিন্তা তার মাথায় ঢোকে। অন্যমনস্ক হয়। চিন্তায় আসে বড়মেয়ের সাইকেল এখনো বাকী।

খবর এলো অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় তমলুক থেকে প্রফেসন্যাল ট্যাক্সের অফিসার এসেছে। ট্যাক্স-অফিসার তারা খাতা দেখে সরকারের হাতে টাকা তুলে দিতে এসেছে। সমাজবন্ধু। দেশটা এগোবে বলে ট্যাক্সী থামিয়েই যে বেঁটে লোকটা নামলো সে জানালো তারা ট্যাক্সের লোক। অ্যালুমিনিয়াম কারখানার মালিক মানে একটা বছর ত্রিশেক বয়েসের লোক। হাওড়ার কোন এক কারখানায় কাজ শিখে এসে নিজে হাতে এখানে কড়াই উৎপাদন করে। বাজারে দেয়। বিক্রি করে। সমস্ত খরচ-বরচ করে যা থাকে তাতে তাদেরও সংসারটা চলে। সংসার এমনই চলে যে টাকা-পয়সার জন্যে এই বিনি-বেতনের দিনেও ভাইকে স্কুল ছাড়িয়ে দিতে হয়। হায়! হায়!

খাতা কোথায়?

কী খাতা?

হিসাবের খাতা।

'এই নিন।' বলেই খাতা ধরিয়ে দিলো মালিক। খাতা উলটে-পালটে কিছুই বুঝতে পারলো না। না পারবেই বা কেন। বিদ্বান লোক। আসলে তারা তো খাতা দেখতে আসেনি। দেশের মঙ্গল করতে আসেনি। এসেছে ধান্দা করতে।

মালিক বড় শান্ত প্রকৃতির। ভীষণ শান্ত। হঠাৎ রাগে না। রাগলে গরুর গামছা বইবে না সে। বললো, কিছু বলবেন? চা খাবেন? তারা বললো ঠাট্টা করছেন তমলুক থেকে চা খেতে এসেছি। চলুন আমাদের সঙ্গে ট্যাক্সীতে।

তার মানে? 'পঞ্চায়েতে যাবেন?'

'ওদের কাছে আমরা কেন যাবো।'

একটা লম্বা করে লোক বললে, 'দাসবাবু, ওকে নিয়ে যেয়ে কি হবে? আরে ও ভাই এসব ঝ্যামেলায় লাভটা কি হবে? সাতশো

টাকা দিয়ে দিন। খাতাপত্তর নিয়ে একদিন তমলুক চলে আসুন।'

আগুপিছু না ভাবতে পেরে সাতশো টাকা যোগাড় করে তারা দিল। পরিবারের দু'ভাই তিনটে মেয়ের সারা মাসের পরিশ্রমের সমস্ত ঘাম, সমস্ত রক্ত নিয়ে চলে গেলো তমলুকের প্রফেসন্যাল ট্যাক্স্-অফিসারের দল। দেশপ্রেমিক বন্ধুরা।

ছিঃ! ছিঃ! কী লজ্জা! স্বাধীন দেশ আর দেশের বেহায়া সরকার! থুঃ! থুঃ!

গয়ারাম থু থু করছিল। এসব শুনতে শুনতে তার গা কাঁপছিল বটে কিন্তু এত রাগ হচ্ছিল মনে মনে যে পোড়া সিক তাতিয়ে শালাদের চাবকাই। তারা নাকি বলে গেছে এখানের সব কারখানায় হানা দিয়ে ফেনা বার করবে কুটির-শিল্পের।

বিকেলের চাপানো ঢালা নামলো সন্ধ্যায়। গন্গনে আঁচের মধ্যে দাঁড়িয়ে ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো গয়ারাম, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের মা সাবিত্রী বছর-ত্রিশেক বয়েসের বাছা অশোক আর বাইশ-চব্বিশ বছরের কালোমেয়ে বৌমা এই ভারত নামক উপমহাদেশের ভীষণ আঁচের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঢালাই করছিল। যে আঁচে লোহা পিতল সিলভার গ'লে জল হয়ে গেছে সেই মহা ভয়ঙ্কর আঁচের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবিকার জন্যে লড়ে যাচ্ছে গয়ারাম এবং তার পরিবার।

গা-হাতের ঘাম মুছে বনুপাড়ায় তাড়ি খেতে গিয়ে মজা জমিয়েছে গয়ারাম। সেখানের আলোচনাটা তার ভাল লাগেনি। এতদিনের ব্যবসায় পুলিশ কখনো হাত দেয়নি এদের গায়ে। তারা মাসোহারা করতে চাইছে। টাউনবাবু বলে একটা আইনের চাঁই জানিয়েছে তাকে পুজো না দিলে সে এ ব্যবসা বন্ধ করে দেবে তবে সে আড্ডায় এটাও জানাল পুলিশের মধ্যে ইদানীং নূতন দল হয়েছে তারা নাকি ঘুষের বিরুদ্ধে। সমস্ত রকমের অভ্যাসের বিরুদ্ধে।

গয়ারাম নেশাগ্রস্তের মতো বললো, 'এপিঠও যা ওপিঠও তা।'

রাতে ফিরে এলো গয়ারাম। চোখের নেশার চেয়ে একটু বেশী নেশা হয়েছিল তার। বাড়িতে এসেই শুনলো ষোলটা বদনার মধ্যে তেরটা মাল কেটে গেছে। তিনটা মাত্র ভাল আছে। মুহূর্তের

মধ্যে সে যেন দম-বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হোল। গতকাল ও তার আগের দিনসহ পর পর চার জ্বাল মালের মধ্যে প্রায় আড়াই জ্বাল মাল ধ্বংস হয়ে গেল। কম-সে-কম ক্ষতি একহাজার টাকারও বেশী। যেন অন্ধকার দেখতে লাগলো সে। উঠানেই বসে পড়লো গয়ারাম।

সাবিত্রীর মনে হচ্ছিল সময়টা বুঝি তাদের ভাল যাচ্ছে না। সে গয়ারামের পাশে এসে বসলো। একটি তালপাতার পাখা নিয়ে হাওয়া দিতে লাগলো। গয়ারাম বললো, 'দুগ্‌গীর ঘরে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। ভাবলুম এবার জামাইয়ের পাওনা সাইকেলটা দিয়ে দেব।' সাবিত্রী বললে, 'আংটিটা তো খেয়ে ফেলেছে দিয়েই আর কি হবে? চলো খেয়ে নেবে।'

বাড়ির ফেতীটা ঝাঁউ ঝাঁউ করে উঠলো। গভীর নিশুতি রাত। তিনজন লোক ভিটের নীচে আর্তের মতো চীৎকার করে ডাকতে লাগলো গয়ারামকে। এমনিতে দুশ্চিন্তা, তার উপর তাড়ি খাওয়ার একটা আমেজ এই দুইয়ে মিলে গয়ারাম একটু গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল। সাবিত্রী নাড়া দিয়ে ডাকতেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো গয়ারাম। খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে কুকুরকে ডেকে নিল সে।

আগন্তুক তিনজন এসে পরিচয় দিয়ে বললে, 'আমরা দাসপুর থেকে আসছি। নিতাই পাঁজার খুড়তুতো জাঠতেতো ভাই আমরা। আপনার বড় মেয়ের ভীষণ অসুখ। সংকট চলছে। পারলে আপনারা কেউ চলুন।'

সেই নিশুতি রাত। গাঢ় অন্ধকার। দূরের শেয়াল বুঝি অনেক রাত ভেবে হুঁকাহুঁকি বন্ধ করে দিয়েছে। ভিটের নীচের শিরীষগাছের মগডাল বরাবর একটা দামাল নক্ষত্র বজ্জাতের মতো কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে আছে, কেউ কোথায় ধারে কাছে নেই। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার বা দূরের বিলে প্রান্ত থেকে বুনো ভামেরও বাপ্‌ বাপ্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মাত্র দুটি পেঁচা এতগুলো লোকের চীৎকার ও কুত্তার নাকানিচোকানি দেখে ছুটে এসেছে। তাদেরই উঠোনের বাঁশ থেকে পেঁচা দুটো উড়ে গেলো তেঁতুলগাছের দিকে।

সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, ভ্যাপ্‌সা গরমের ভেতর কেউ কিছু

বলতে সাহস পেলো না। বুঝি এরপর কার কি বলা উচিত কারও জানা ছিল না।

বাইরের এই উত্তাপের মধ্যে ভাপ্‌তে ভাপ্‌তে সাবিত্রীর ভেতরের হিমকে গলিয়ে দিচ্ছিল তার ক্রোধ অভিমান মমতা। মুহূর্তের নীরবতা ভেঙে দিয়ে চীৎকার করে বিনিয়ে বিনিয়ে তার কান্না চতুর্দিক কাঁপিয়ে দিল: 'ওরে ওলাউঠোরে তোদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়ুক রে—এত রাতে কী খবর দিলি রে···।'

তেষ্টা

গন্‌শাকে সবাই চেনে   সাতপুরুষের জন্মকালো ফেঁতী-মাকা চেহারার অভিশাপ সে। জীবনে সুখ কাকে বলে সে চেনে না। দুঃখ কাকে বলে জানে না। "কষ্ট কষ্ট এগারো মাস একমাস তাল কাট আর ভাত খাও" এর অর্থেই তার চালচলন জীবন যাপন। সে সব কিছুকে অবস্থার চাপে মাথা পেতে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

পালকীর সময় পালকী যায়
চাষের সময় মাঠে
ক্ষিদের সময় পায়নি খেতে
কাজ জোটেনি হাতে।

তবে ছোটবেলায় অনেক করেছে সে। দশ-বারো জনের একটা জোয়ান গ্রুপ করে রাস্তায় ফিতে খেলে ঘণ্টায় শ'য়ে শ'য়ে টাকা উপায় করেছে। সে টাকা তার কোনদিন নিজের ভোগে লাগেনি। দুলেপাড়ায় মেয়েদের বিয়ে দেওয়া. শ্রাদ্ধ কবা এইসব কাজেই খরচ করেছে সব টাকা-কাঁড়ি।

সে যখন শহরের দিকে বেড়াতে যায় হাজার-তালি-লাগা একটা প্যাণ্টলুন পরে। ঘাটালের কে একটা বড়লোকের বেটা তাকে এই পুরানো প্যাণ্টলুনটা দান করেছিল। এমনি না। তার কি-একটা অপকীর্তি ধরা পড়েছিল গন্‌শার হাতে। তাই তার থেকে রক্ষার জন্য দান করেছিল সে। গন্‌শা তাতেই তালি মেরে চালায়। কেউ জিগ্যেস করলেই সে সেই অপকীর্তি ফাঁস করে দেয়

এখন গন্‌শার বয়স হবে বৈকি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বটেই। সে কাউকে তোয়াক্কা করেনি। সবাইকে 'তুই' বলে। আসলে তার ভয় কি! তার মা হাজতে ভাত রাঁধে। ঘরে সে আর তার বৌ। মদের ব্যবসা তাদের নিজেদের। কিশোরীর দোকানের পচা গুড়, কুমোরের

কালো হাঁড়ি আর ঘাটালের আবগারীকে পয়সা দিয়েও আবগারীর লাথি খেয়ে গন্‌শার হৃৎপিন্ড এখন ঠান্ডা হিম। সেও মনে করছে আবগারীকে একটা ফের লাথি মারবে। শালাদের পয়সা খাওয়া ছুটাবে সে। ব্যাটারা বাগে পড়ছে না গন্‌শার। একবার বাগে পড়লে আবগারীর তলপেট চুইয়ে দেবে জন্মের মতন।

কিশোরীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল। মজুর-মালিকের সম্পর্ক। মাঝে মধ্যে কাজ করে তার। ক'বছর কিশোরীর একটা জমি ভাগে করছে গন্‌শা। গন্‌শার পৈঠার নীচেই কিশোরীর এক-চিলতে দশ কাঠা জমি। তার ক'বিঘা পাশেই কিশোরীর পাঁচ বিঘার বন্দ। সে জমিটা চাষ করে অন্য লোক। কিশোরী নিজে হাতে সব জমি চাষ করতে পারেনি। তার মোট জমি চোদ্দ-পনেরো বিঘা হবে। যে-কোনপ্রকারে সংসারে ধানটা পেলেই হোল।

কিশোরীর সংসারের আসল আয় তার ভূষি-দোকান আর বেআইনী বন্ধকী কারবার। সে তার দোকানের দরজা আড় করে নারকেল-তেলের সঙ্গে রেপসীড, সোডার সঙ্গে চুন, পস্তুর সঙ্গে ভারী ঠোঙা, খাবার তেলের সঙ্গে বিষাক্ত ঢুকিয়ে শীল করে। চোরাই রেভিনিউ টিকিট, পোস্টকার্ডের ঢালাও ব্যবসা করে।

নিজে হাতে জমি যে চষতেই হবে এটা তার কোষ্ঠীতে লেখেনি কেউ। মাথার দিব্যিও দেয়নি।

কিছুদিন ধরেই কিশোরীর কেমন ভয় পাচ্ছে। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। চারপাশের জমি লোকেরা ভাগ রেকর্ড করছে। ক'বিঘা তারও তো ভাগে দেওয়া আছে। তাছাড়া জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। গাঁ-গেরামে কাজ নেই। মানুষ খেতে না পেলে? তার টাকা-কড়ি হামার সম্পত্তি ঃ যদি কোন অঘটন ঘটে। এ মাসে কেনা-বেচা একদম কম। মানুষের বড় অভাব। তারা মরীয়া হয়ে উঠেছে।

গন্‌শার বড়ভাইপো কেতোর যেবার টক্‌সীমা হয়েছিল সেবার রাতারাতি গেলাস ঘটি আর তার মা'র বিয়ের পুরানো শাড়ীটা বন্ধক রেখে পঞ্চান্ন টাকার মতো দিয়েছিল। শেষে দুটো নারকেল-

গাছ বন্ধক রেখেছিল কিশোরী দত্ত কুড়ি টাকার জন্য।

গনশাকে কিশোরী বলেছিল, 'তোর দাদাকে বলবি টাকাটা মিটোতে।' দাদা ননী এসে অনেক হিসাবপত্তর করে দেখলো দু'শ ছাব্বিশ টাকা বারো আনা হয়েছিল সুদে আসলে। পায়ে ধরেও সে খুচরোটাও কমাতে পারেনি। সে তখন ননীকে বলেছিল উপকারের নেশায় বন্ধক রাখি। না হলে ব্যবসায় থাকলে অনেক লাভ হোত। তোমাদের বিপদ চোখে দেখতে পারিনা তাই। উপকারের কথা শুনে ননীর মুখে থুথু এসেছিল। সে বললে, ঘেন্নায় গা ঝিম্ ঝিম্ করছে তোর কথা শুনে কিশোরী।

কিশোরী তখন রাগে গরগর করেছিল বেড়ালের মতো।

সন্ধ্যাবেলা ভাইকে দোকানে বসিয়ে পুকুরঘাটে পা হাত মুখ ধুয়ে গামছায় গা মুছতে মুছতে দরজায় কড়া নাড়ল। ভিতরে মা বললে, 'কে রে, কিশোরী এলি ?' রোজ এসময় কিশোরী ঘরে চা খায় মা'র হাতে।

—'হ্যাঁ, মা দরজা খোল।'

মা একটা কানাইডুম জেবলে একটা কাগজ ধরে এনে দিলে কিশোরীর হাতে। 'সে বললে, চৌকিদার এই কাগজটা দিয়ে গেল। সে বললে, সই করে দাও। সই করবো নি, সেও ছাড়বে নি। আমি ওদের জিগ্যেস করে সই করে দিইচি।'

—'একটু চা হবে মা ?'

—'গা তোর গরম নাকি' বলেই ছেলের কপালটায় হাত দিয়ে বললে, 'বস্-না, করে দিচ্ছি।' বলেই মা চলে গেল।

কাগজ দেখেই সে বললে, 'গনশারা বর্গা করছে।' জমির কথা মনে হলেই কিশোরী কত যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার মনে হয় মা-লক্ষ্মীকে তার হামার থেকে তারা যেন পিঠমোড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। তার মন খারাপ হয়ে যায়।

দেখা যাক শেষরক্ষা হয় কিনা। সে এই ভেবেই পঞ্চায়েতের কাছে দেখা করতে গেল। সে বলছে গনশার কি ক্ষতি করেছে যে গনশা তার জমি রেকর্ড করবে। দরকার নেই উপকারে জমি

গন্শাকে ছাড়তে হবে আমি নিজে চাষ করবো।

রাতে প্রধানের সঙ্গে দেখা হোল না. পরের দিন ভোরবেলাই ছুটল প্রধানের ঘরে। প্রধান সব শুনে হতাশ করলো কিশোরীকে। তাকে পরিষ্কার জানালো কোন সত্যিকারের ভাগচাষী চাষ করলে রেকর্ড করতে তাকে সাহায্য করবে।

—'আপনি রেকর্ড মেনে নিন কিশোরীবাবু। কি হবে আপনার। থাক্না গরীব মানুষ।' প্রধান বললো।

—'না বাবু, আমার বড় অভাব। চারিদিকে দেনা। এটা কি ঠিক হোল। আমার জমিটা কিনে নিক সে।'

—'সে আমি কি করে বলব।'

গন্শাকে আমি ছাড়ব না। ও দেখা যাবে। বলেই, নমস্কার করে উঠে পড়লো কিশোরী।

বড় রাস্তা পার হয়ে ঘরের রাস্তায় নামতেই মনে হোল বর্গাটা মেনে নেওয়া দরকার। তার আসল আয় ভূষিমাল আর বেআইনী বন্ধকী ব্যবসা। সে ভাবলে ওদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখলে তবেই ওরা চিরকাল খদ্দের থাকবে। তাই সে ভাবলে বাছাধনকে টাকা ধার দিয়েই কাৎ করে দোব। জমির জন্য একবার আপসোস আর ব্যবসার কথা ভেবে কিশোরী দত্তকে আর ভাল লাগছে না।

বেশ ক'দিন টাইফয়েডে ভুগে গন্শার হাড় ক'খানা জিরজির করছিল। এখন তাতে একটু মাস লেগেছে। কিন্তু খেতে পাচ্ছে না।

দু'দিন কিছুই জোটাতে না পেরে ককিয়ে ককিয়ে এলো সাত-সকালে কিশোরীর কাছে। বললে, 'কাজে লাগা কত্তা।'

কিশোরী ভেংচে বললে, 'কোথায় লাগাব কর্ত্তা।'

শুনে রাগ হচ্ছিল গন্শার। তা হবে বৈকি। সেই মুহূর্তে শরীরে বল ছিল না। বললো, 'কত্তা তোর সব ধান আমিই হামারে তুলেছি, তোর সব জন-মজুরদের চেঁচিয়ে পচাল করে কাজ করিয়েছি অসুখের আগেও তোর বিনা পয়সায় করেছি আজ নিবিনি কেন?'

—'কোথায় লাগাবো তোকে?'

—'কেন তোর পাট নিড়ানো হচ্ছে। বাচ্চা আর মেয়েদের নিয়েছিস তুই, আমাকে কাজে নিবিনি কেন ?'

—'ওরা এক টাকা আর মুড়ি-ভাতে কাজ করছে. তুই করবি তো লেগে পড়।'

—'সে কিরে কত্তা। বাজার ছ'টাকা ভাত মুড়ি তুই একটাকা খাটাচ্ছিস।'

—'অত প্যান্ প্যান্ করিসনি তো যা তোকে খাটাব না'

গন্শা ভাবলো, না. খাটবো না। আবার ভাবলো, না খাটলে চলবেই বা কেন।

খানিক বাদে সে বললে. 'তাই হবে। তাহলে কাজ করি।' বলেই সে চলে গেল জমিতে। যাবার সময় বললে. 'কত্তা তুই মুড়িটা পাঠাবি তাড়াতাড়ি।'

কিশোরী চোখকে ট্যারা পাকিয়ে বললে. 'শালা আমার কুটুম রে, আগে তোর কাজ দেখি তার পর দেখা যাবে।'

লজ্জা ঘেন্না সব সহ্য করেও গন্শাকে মাঠে যেতে হল। গা থর-থর করছিল। কোনক্রমে জমিতে বসে বসে ভিরমী খেতে খেতে পাট নিড়াচ্ছিলো। মনে হচ্ছিল একমুঠো পেটে পড়া এখখুনি দরকার। রোদ কানের মগডালে উঠেছে। বেলা বুঝি বারোটা। চোত্তির মাসে রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে মাঠ গা হাত।

এক কলসী জল আর একটা মুড়ির বুচ্কি জমির আলে নামিয়ে চীৎকার করে ডেকে বললে. "নে বেলা হল আয় খেয়ে নে।"

কিশোরী খুব হিসাবী লোক। ভাইয়ের সঙ্গে সংসার চালানোর যুক্তি করে। তাড়াতাড়ি মুড়ি নিয়ে গেলে মজুররা ঠুসে খাবে আবার শালারা ভাত এত খাবে যে হাঁড়ি ফাঁকা করে দেবে। সে প্রচুর খরচ। তাই জনমজুরকে জব্দ করতে হলে জলখাবারটা দেরী করে খাওয়াতে হবে। আর জলখাবার খাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ভাত খেতে দিলে শালারা ভাত খেতে পারবে না। অথচ প্রমাণ হবে যে কিশোরী দত্ত চামার নয়। সে লোক খাওয়াতে জানে। ভাই বলেছে 'বেশী কি তরকারী করবে মজুরের জন্যে।'

তড়াক করে হেসে ফেলে কিশোরী। বলে, 'তরকারী না ঝাঁটার ঘণ্টা খেসারীর ডাল আর বৈতাল ভস্মের একটা যাহোক করে দিলেই নিয়ে আয় নিয়ে আয় করবে।' তাই সে সবার আগে জনমজুরকে খাওয়ায়। লোকে বলবে কিশোরী লোককে ভালবাসতে জানে।

ভাবতে ভাবতে হাসলো কিশোরী। তার চোখে মুখে বড় খুশীর ছাপ। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ডাকল, 'আয়, বেলা হোলো। একটু দেরী হয়ে গেছে। দোকানে যা ভেজাল। শরীরকে কষ্ট দেওয়ার দরকার নেই। আয় আয়, একমুঠো খেয়ে নে।'

জলখাবার দেখে তাড়াতাড়ি তার ভাগের খাবার পাবে বলে ছুটে আসতে লাগলো গনশা। গনশা যেন জমির ও-মাথা থেকে এ-জন্মের শোধ ছুটে আসছে। দে একটু জল দে, একটু খেতে দে কত্তা।

গনশার হঠাৎ ছুটে আসা দেখে কিশোরী ভীষণ ভয় পেল। সে দেখলো গনশা হাতের খুরপা শক্ত করে ধরে তেড়ে আসছে তার দিকে। গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখ মুখ তেড়ে একটা কালো, ভীষণ জংলী আর বর্বরের চেয়ে তেড়েল হিংস্র জীব হয়ে উঠেছে যেন সে। এক মুহূর্তের মধ্যে মনে হোল সারা জীবনের যত অন্যায় যত পাপ করেছে গরীব মানুষকে ঠকিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসছে রোগ-লেলচা গনশা। ভয়ে হৃৎপিণ্ড দুড়দাড় করে উঠলো কিশোরীর। সঙ্গে সঙ্গে কী করবে ঠিক না করতে পেরে গনশাকে পিছন করে ছুটতে লাগলো সে। কিশোরী এক মুহূর্তে সমস্ত অপরাধ থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইলো।

দু'মিনিটের মধ্যেই একটা গোঁৎ করে শব্দ হোল, সঙ্গে সঙ্গে কলসীটা পড়ে যাওয়ার শব্দ। ছুটতে ছুটতে কিশোরী পিছন ফিরতেই দেখলো কলসীর উপর উবুড় হয়ে পড়ে গেছে গনশা। ভক্ ভক্ করে কলসীর জলটা তার পাশে ঢালা হয়ে গেল। হায় হায় করে ছুটে এলো ক্ষিদে তেষ্টায় ক্লান্ত সঙ্গের মজুর মেয়েরা। তারা অজ্ঞান গনশার চোখে মুখে জলের ঝিটা দেবার চেষ্টা করেও দিতে পারল না।

ফিরে এসে কিশোরী দেখলো, কলসীর সব জলটা ঢালা হয়ে গেছে। গন্‌শার ঠোঁট কেটে গালাচি বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

কিশোরী বিরক্ত হয়ে বললে, 'ছোট জাতের মরণ আছে রে!'

অনেকক্ষণ পর গন্‌শা বললে, 'একটু জল দে...।'

থলে

কিছুতেই থলেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ থলেটার ভীষণ দরকার। গিরির মাথাটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠেছিল কোথায় থলেটা যেতে পারে। কোনরকমের হদিশই পাচ্ছে না ভেবে মনটা ভীষণ খারাপ করছিল একটা থলের দাম তো নেহাত কম নয়।

কান থেকে আধপোড়া বিড়িটা মুখে নিয়ে পাটকাঠির আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে নিল সুখে একটা টান মেরেই খক্ খক্ করে কাশতে লাগলো। আহা! আস্তে খেলে তো হয় বাপু।

সেবার ক'বছরের ডালা হাজায় যখন মাঠগুলিতে ফসল হচ্ছিল না। সে-বছরই ছেলেপুলেদের বাঁচাবার জন্যে কী পরিশ্রমই না করতে হয়েছে মানুষজনকে। চাল্‌কে করত গিরি।

ঘাটাল শহর থেকে চাল কিনে রাণীচকের হাটে বিক্রী করতে নিয়ে যেতো সে কী ঘেন্নার জীবন যাপন! প্রাণধারণের জন্য কত মানুষের বেহায়াপনা সহ্য করতে হয়েছে তাদের। এস. ডি. ও. অফিসের সামনেই দুগ্‌গোপুজোর চাঁদার জন্যে হেলে-দা শহরের কুকুর লেলিয়ে দিত। জোর করে কেড়ে নিতো দেড় টাকা, তিন টাকা, পাঁচ টাকা। কেউ না দিলেই জোর করে চালের বস্তা নামিয়ে পাঁচ সের চাল বের করে নিতো। যেন বাপের জমিদারী। মাস্টার রামানন্দ ঘোষের চামড়া এত পুরু ছিল সে এসব মোটা লেন্সে দেখতে পেতো না। তবে চা-দোকানে প্রগতিশীল কথাবার্তা বলতো বটে জ্ঞান দিতো। সন্ধ্যায় আবার ওদের সঙ্গেই চাঁদার হিসেব করতো।

রাণীচক রাস্তার উপর চলতো পুলিশের জুলুম। যেন নির্লজ্জের বাহানা। ভাবটা এমন: তুমি শালা গরীব হয়ে জন্মেছ

কেন হে। লাইসেন্স নেইতো চাল কিনছো কেন।

মনে মনে হাসলো গিরি। তখন তাদের মুখ্যমন্ত্রীর ছিল কানচাপা চুল। লালটুস্ কুঁতকুঁতে চেহারা। শোনা গেছলো, তখন মহাকরণের পায়খানা এয়ার-কন্ডিশন হচ্ছে। সে সময় ঘরের খাবার জন্য পাঁচ কিলো চাল কেনবার অধিকার ছিল না। অধিকার থাকবেই বা কেন। একটা গর্ভিণী মেয়েকে হারামজাদা পুলিশ প্রকাশ্যে চাল আনছে সন্দেহে কী নির্যাতন করেছে। তা গিরি নিজের চোখে দেখেছে। তাও কি পাঁচ কিলো চাল তো এক-সঙ্গে নিতে দেবে না।

ঠিক দুপুরবেলা। প্রায় একটা-দেড়টা। গন্গনে আগুন। চোত্তির মাস। মনসাতলার সামনে চলে এসেছিল। মাথায় চল্লিশ কিলো চাল নিয়ে আসছিল সে। দরদর করে ঘাম বের হচ্ছিল। ডান পায়ের তলায় ছিল গুটিবাজা রোগ। খালি পায়ে চলতে পারতো না। এখনো পারেনি। চটি ছিল তার পা-দুটোয়। হঠাৎ একটা কালো রকমের কন্সটেবল পেছন থেকে হাঁক দিল 'এই—দাঁড়া'। যেন সে কত অন্যায় করে অপরাধগুলি বস্তাবন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে আর ধর্মপুত্তুর পুলিশ তা উদ্ধার করে আহ্লাদে গলে জল হতে চাইছে।

গিরির ভীষণ ভয় লাগছিল। সে রাস্তায় নেমে সোজা পাইরীর মাঠের দিকে মাথায় ঐ মণখানেক বস্তা নিয়ে ছুটতে লাগলো। সেই মাঠ যে মাঠে কেঁচো মাটি সুঁচ হয়ে আছে। গ্যাঁড়া গুগলি শামুক খোলে ভর্তি। সেই ভাঙা গ্যাঁড়ার খোলে কখন তার পা কেটে গিয়েছিল বুঝতে পারেনি। সে দাগটা এখনো মুছেনি। মুখের কথা ফুরাতে না ফুরাতেই পুলিশটা ছুটে এল হাঁসফাঁস করতে করতে। একেই গুটিবাজা, তার উপর জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গল্‌গল্ করে রক্ত বের হচ্ছিল। তার উপর পুলিশের দাবকানি : 'দে শালা পঁচিশটা টাকা দে, না হলে চল্ থানায় চল্!' সে কী হেঁচকা টান।

অবশেষে কলেজের দুটো ছেলের অনুরোধে চালটা ছেড়ে দিল।

অবশ্য চোখ রাঙিয়ে সাবধান করেছিল সে, খবরদার যেন কোন কলেজের ছাত্র এ ব্যাপারে হাত না দেয়। সাপের মুখ থেকে ব্যাঙকে কেউ ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয় তেমন করে গর্‌গর্‌ করতে করতে বললে: কালোবাজারী শালা ঘুচিয়ে দেবো।

এসব দেখার পর গিরির দিব্যজ্ঞান হোল: সত্যিই বটে পুলিশ বেটাচ্ছেলেরা চাষী কামার কুমোর মুদ্দোফরাস মুচী মেথরের গাঁট কেটে মফতের মাল গিলছে। বেতন পাচ্ছে আর মানুষের ট্যাঁক কাটছে। তারা জ্বালাবে না তো কে জ্বালাবে। বেশ ভালো আছো বাপধন। রাণীচকে চাল্‌কে করতে হলে বুঝতে পারতে কত ধানে কত চাল। সে যাত্রা-বেঁচে গিয়েছিল গিরি। সেবারই প্রথম তিনখানা চিনির থলে কিনেছিল সে। আগে সে জনমজুর খাটতো। কিন্তু এই প্রথম চাল বিক্রির জন্যে থলেকে কাজের কাজে লাগাতে পেরেছিল।

ভাই গোবিন্দকে বছরখানেক আগে একটা থলে দিয়েছিল। হ্যাঁ ঠিক মনে পড়ছে তার। মুখের বিড়িটা ফেলে দিয়েই হুমড়িয়ে গেলো গোবিন্দর কাছে। জিগ্যেস করতেই প্রায় মনে করে গোবিন্দ বললে, 'হ্যাঁ এনেছিলুম, সে তো আমার—প্রায় মনে নেই। দাঁড়াও দিকি জিগ্যেস করি।'

মাপে বেঁটে-খাটো বলে তাকে কেউ নির্মলা বলে ডাকে না। তাকে সবাই আদর করে ডাকে গেঁড়ি বলে। গেঁড়ি গোবিন্দর কথায় মনে করতে পারলো না।

গিরির পেড়াপেড়ীতে রাতভোর খোঁজাখুজির পর মনে পড়লো থলে আনা হয়েছিল। কিন্তু সেটা তো ঘরে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোথায় যেতে পারে। গেঁড়ির ভাই আবার সেই থলেটাই অষ্টমপ্রহরের সময় কপি কিনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে তো ফিরে আসেনি। সুতরাং গিরিও পায়নি।

গিরি জানিয়ে দিলে থলেটা দরকার। বিকেলেই ফেরত দাও।

ইতিমধ্যে গিরির বৌ ভীষণ রেগেমেগে একপ্রস্থ গালাগালি করে জানিয়ে দিলো, গোবিন্দ আর গেঁড়িকে তারা ভীষণ সরলসিধা

লোকজন ব'লে জানতো। তারা তাদের উপর চাপ দিচ্ছে না। খুব বেশী না হলেও সুদে আসলে আদায় করে নিতো। সবটাই। তবে তাদের থলেটাই চাই। সেটা তাদের পয়মন্ত থলে। গায়ের চামড়া দেবে কিন্তু থলেটা ছাড়তে পারবে না।

কোনরকমে ঠেকা দিতে দিতে বেঁচে আছে দু'জনেই। দু'জনের সঙ্গতির সঙ্গে আদপে কোন তফাত নেই। দু'জনেই প্রচণ্ড অভাবী। খাটলে খাবে এই রকম।

গিরি লক্ষ্য করেছে গোবিন্দ তাকে অনেকদিন ধরে এড়িয়ে যাচ্ছে এটা তার দেমাক্ বলে মনে করে। রাতে ফিস্‌ফিস্ ক'রে 'পরিবারের' সঙ্গে ঠিক করে ফেললো থলের ক্ষয়-খেসারত আদায় করে নেবে। ভেবে খুশী হোল একেবারে গেঁড়াগেঁড়িকে পুঁতে ফেলবে এই থলেতেই। সে থলে কোত্থেকে পাবে।

ক'দিন পরেই গজ্‌গজ্ ক'রে পাড়ার মেয়েদের জানিয়ে দিয়েছে গিরির বৌ। কারুর মাথায় উকুন দেখতে দেখতে। কারও ঘরে দু'টো লাউডাঁটা চাইতে গিয়ে। কাউকে জল আনতে গিয়ে ব'লে-ক'য়ে বেড়াচ্ছে। ছোটলোক দেওর তাদের থলেটা মেরে দিয়েছে।

লোকমুখে শুনে, ঘুম থেকে উঠেই সাতসকালে ভিটের এঁ্যাদালে-কঁ্যাদালে গোবরজলের ছড়া দিতে দিতে চীৎকার করে গেঁড়ি সবাইকে জানাতে লাগলো : 'বোনমেগো শুয়ারভাতারিরা তা লোকের কাছে গেয়ে বেড়াচ্ছে কেন ? লোকেরা তাদের ঘর থেকে থলে দিয়ে যাবে কি ?' আরো কত কী।

বিছানা থেকে তড়াক্ করে লাফিয়ে গিরিও লাফালাফি করে খেউড় শুরু করলো। গিরির মনে হোল মেয়েটার গালে চড় মারা উচিত। একবার ইচ্ছে করছিল মাগীকে ফেলে কঁ্যাৎ করে লাথি মারে। কেমন যেন মনে হোল তার। গেঁড়ির ঘর পর্যন্ত ঢুকে গেলো। তাকে টেনে নিলো তার বৌ। দু'পাঁচজন এসে উঠানে জড়ো হোল সেই মুহূর্তে। ছুটে গিয়ে একটা হেঁসো কোমরে এঁটে, তাড়ির ডাবরি নামাবার জন্য দ্রুত বাঁশ বেয়ে তালগাছে উঠতে উঠতে গালাগালি দিতে লাগল। গাছের মাথা থেকে চিৎকার করে

জানিয়ে দিলে, থাপ্‌ড়ে মুখ ভেঙে দিতে পারতো কিন্তু সেরকম লোক নয় বলেই সে তা করবে না।

লণ্ঠনের বাতিটা জোরে জ্বলছিল। বারো-চৌদ্দজন লোক বসে ছিল একটা ছেঁড়া-চাটাইয়ের উপর। ভ্যাপসা গরম। ভক্ ভক্ করে তাড়ির গন্ধ বের হচ্ছিল। তারই মাঝখানে হেলেদা বসে আছেন। হেলেদার মাঝ আঙুলটা কাটা। তালআঁটি কাটবার সময় আঙুলটা বাদ পড়েছিল। পয়সাঅলার বেটা বলে গলায় সব সময়ই থাকত একটা সোনার হার। তাই তাকে ছোটবেলা থেকে লোকে হেলেদা বলত।

লোকটার কাজই হোল সবকিছুর চুল চিরে বিচার করা। কোন সমস্যা এলে অদ্ভুত দক্ষতায় বিশ্লেষণ করতে পারে সে। মীমাংসা পারে না। ঠিক এস.ডি.ও.'র মতো। ফলে, তাকে ডাকে সবাই। ভয় হয় মীমাংসা হয়নি বলে। যেহেতু পাড়ায় থাকে তাই তার ডাক। সব গুণ আছে লোকটার। লোকের পারিবারিক উৎসবে ডাকলে, কিভাবে সে সেই বিপদ থেকে উঠবে সে-ব্যাপারে ধার হাওলাত করে সাহায্য করতো। আর উপকার করলেও মজুরী পুষিয়ে নিতো। আসলে হতচ্ছাড়া কুমীরবাচ্চাকে কোলে করে শেয়ালের মুখে তুলে দিলে যেমন হয় তেমন হোত। এখনো সময়ে অসময়ে তেমনই করে মরে। জট ছাড়ানো নয়, জট পাকানোই তার কাজ। সে একটা রাজনীতিও করে।

হেলেদার কথামতো গোবিন্দর থলেটা আনা হোল। ক'দিন আগে গোবিন্দ শ্বশুরবাড়ি থেকে এটি উদ্ধার করেছে। ভাল করে পরীক্ষা করা হোল। কারুর গন্ধ লাগছিল। কেউ কেউ কোন গন্ধ পাচ্ছিল না। বিষে বিষক্ষয়। বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা দরকার সত্যিই গিরির থলে কিনা। কত তার দাম। কতদিন গোবিন্দর কাছে ছিল। কতটা তাতে ইনকাম হতে পারত। কত ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত ইত্যাদি। সব খুঁটিনাটি হিসেব করে হেলেদা রায় দিলো তিনশো পঁচাত্তর টাকা পঞ্চান্ন পয়সা দেওয়া উচিত। কথাটা শুনে পিলে চমকে গেল অনেকের। গোবিন্দ হাউমাউ করে উঠলো।

ফিস্‌ফিস্‌ করে একজন বললো, 'ধুর বাবু! ইটা কথা!' কেউ বললে, 'পঞ্চান্ন পয়সা করলে কেন হেলেদা।'

হেলেদা গম্ভীর গলায় বললে 'ওটা পানিশ্‌মেন্ট।'

'আশ্চর্য!'

'আর গিরির কি হবে। ও যে বেহদ্দ গালাগাল করেছে। ভাদ্রবউকে থাপড় মারতে গেছে। তাকে মাগী বলেছে।'

'ওর প্রায়শ্চিত্ত নেই। ওর মাথায় একটা এমন ধানের বস্তা চাপিয়ে দাও। আর ঐভাবে ওকে কান ধরে একশো-পঞ্চান্ন বার এখানেই উঠ্‌ বস্‌ করুক। হারামজাদা ভেবেছে কি থাপ্পড় বলেই থাপ্পড়।'

কে একজন কানে কানে বললে, 'হেলেদা গত পরশু তার মাকে ঠেলে উঠোনে ফেলে দিয়েছিল জানিস্‌।'

উত্তর দিল, 'কই জানিনি তো।'

গিরি একদম কঁকিয়ে উঠলো: 'আমি পারব না। আর তাহলে বাঁচবনি। সারাদিন খাইনি। আমার থলে চাইনি। হেলেদা তোমার পায়ে পড়ি।'

একজন হেলেদার কথামতো হেঁচকা টান মেরে গিরিকে বললে, 'চলো। শালা নারী নিজ্জাতন। মানুদা কত আর পারে।'

পড়ি কি মরি হয়ে গিরির বউ কাটারি নিয়ে তেড়ে এলো: 'মুখপোড়া ওর গায়ে হাত দে দিকি দু'কুচি করে দুব। আমার থলে যাবে আর আমার ভাতার বোঝা মাথায় করে উঠ্‌ বস্‌ করবে?'

একটা হুলস্থূল পড়ে গেল।

সতীশ বয়স্ক লোক। মূলতঃ সেই সভার সভাপতি। তাকে মানা না-মানা যেন কোন ব্যাপারই না। পয়সাঅলাদের সংস্কৃতি যা হয় তাই হেলেদা।

সতীশের বাপের এককালে অনেক ছিল। হাট ছিল। জমি ছিল। সব। এ জন্মে তার একটা কানা বেটা ছাড়া কেউ নেই। সে বললে, 'এসব ছাড়্‌! সমাধান কর। কী হচ্ছে এসব।' ভীষণ উত্তেজিত সে।

সবাই থেমে গেল।

'আপনিই বলুন সতীশদা', হেলেদা বললে।

'তুই যা বলেছিস্ ঠিকই আছে। কিন্তু দু'টোই সমান ভারী। দু'জনেই মরে যাবে। দু'টোই অন্যায়। তার থলে ফেরত ঠিক সময়ে না দেওয়া, আবার গেঁড়িকে গালাগালি করা। দু'টোই মহা অপরাধ। কিন্তু কি করবি বল না। সব অন্যায়ের কি আমরা সমাধান করতে পারব? তাহলে তো আগে তোর মরা বাপকে ডেকে আনতে হয় কেননা এদের সব জমিগুলো তো খুদকুঁড়োর বদলে কিনেছিল সে।

কেউ কোন উত্তর দিল না। ভয় হচ্ছিল সতীশ কাকে কি বলে। সবাই শ্রদ্ধা করে তাকে। হেলেদা কেমন অস্বস্তিতে পড়ে গেল।

সে বললে, 'আমি আসব?'

'না না, যাবি কোথা, দাঁড়া। আমি একটা কথা বলি শুন্ সবাই। ভেবে মতামত দে। যেহেতু গোবিন্দ থলে নষ্ট করেছে, ঠিক সময়ে ফেরত দেয়নি সেইজন্য ও দুটো থলে গিরিকে ফেরত দেবে। আর গিরি যেহেতু নিজেই বৌ নিয়ে আক্ছার অনাচার করেছে তাই তাকে ক্ষমা চাইতে হবে সবার কাছে। এজন্যে জরিমানা গিরির হওয়া উচিত। তাই সে দেশ ষোল আনাকে মান দেবে।'

'স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই। কেউ 'না' করল না। একজন বলল, 'সেই ভাল।'

হেলেদা রা কাটল না। গিরি-গোবিন্দ সবাই মেনে নিল। গিরি সবার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলে গোবিন্দ তাকে ধরে ফেলে ক্ষমা চাইলো দাদার হয়ে। সভা ভেঙে গেল। অন্ধকারে পেচ্ছাব বসার নাম ক'রে হেলেদা চোখের আড়াল হোল।

ওরা সবাই চলে গেছে। চতুর্দিকে ঘুট্ঘুটে অন্ধকার। গিরি তার ভিটের নীচে এসে কেন যেন আকাশ দেখছিল। খুব ভাল লাগছিল তার। সে এমন করে আগে কোনদিনও নক্ষত্র দেখেনি। নক্ষত্ররা একা নয়। তারা অনেক ছিল। মুহূর্তের মধ্যে কত কি মনে হোল তার। খুব ভাল লাগছিল। প্রায় হঠাৎই যেন কার একটা হাত তার কাঁধে ঠেকল। বুকটা ঢিপ্ করে উঠলো, জিগ্যেস করল

সে, 'কে ?'

—'আমি।' মৃদুস্বরে উত্তর পেলো সে।

বললো, 'এটা কি বিচার হোল গিরি ? বাবলা পুরী বিচার ?'

—'কি বলবো বাবু ?' গিরি বললো। মনটা একটু খারাপ লাগছিল।

—'কাল সকালে আমার ঘর আয়। সেই পয়মন্ত খলে কি পেলি ? দরকার হোলে আইনে যেতে হবে। মনে রাখবি গিরি, ইজ্জৎটাই সবচেয়ে বড়।'

পরের দিন গিরিকে কোর্ট চত্বরে বসে থাকতে দেখা গেল।

গিরগিটি

সক্কালেই মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে গেল সনাতনের। দাসপুরের কোন সোনাওয়ালার কাছ থেকে ক'শো টাকা ধার করেছিল সে। ঠিক সময়ে সে টাকা শোধ করতে পারেনি। সেই সোনাওয়ালা এই সাতসকালেই তার বাড়িতে এসে বসে বাপ-বাপান্ত করে গেল। তাকে কোনরকমে আকুতি মিনতি করে দেঁতো হাসি হেসে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বিদেয় করলো। এখনো দাঁত মুখ ধোয়া হয়নি তার। ধুতে হবে।

বেতারে তখন গান বাজছিল 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটার দু'এক কলি হঠাৎ কানে যেতেই সনাতন চীৎকার করে জানালো, 'কে জানোয়ারটা রেডিও চালায় রে এখনই বন্ধ কব।'

কারও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। দেখলো গিরগিটি চুল খাড়া করে গান শুনছে। আর কিছু না বলেই দারুণভাবে চপেটাঘাত করলো। শালা পড়াশোনা নেই রেডিও শুনতে লেগেছো? ধনধান্যে পুষ্প ভরা' দেশে অভাব নেই। জমিদারী চলছে। গিরগিটি সেই গানের মধ্যেই ভয়ে চীৎকার করে যন্ত্রণায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে ছুটে পালালো মাঠের দিকে। সনাতন হুঙ্কার ছেড়ে বললো, 'এই ভাল যদি চাস তো ধান বইতে যা। বাপের তেজারতি নেই যে বসিয়ে খাওয়াব।'

অনেক দূরত্ব থেকেও ভ্যা ভ্যা শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

গিরগিটির কান্না এবং সনাতনের চীৎকার চেঁচামেচি একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটাতেই ন্যাতা হাতে ছুটে এলো আহ্লাদী। আহ্লাদী সনাতনের বউ। সকালবেলাই মাথা খারাপ করে চীৎকার যাতে আর না বাড়ে সেজন্যে আরো চীৎকার করে তার স্বামীকে জানাতে

চাইলো সে যাতে আর বাড়াবাড়ি না করে। কিন্তু একজনের যুদ্ধ-আর অন্যজনের যুদ্ধ, বিরতির হুংকার এত বাড়াবাড়ির আকার ধারণ করেছিল যে, প্রতিবেশী কমলা কাকী এসে না পড়লে শেষমেষ মাগ-ভাতারে ধ্বস্তাধ্বস্তি না হয়ে ছাড়ত না। কমলা কাকী এরকমই আরো অন্ততঃ পঞ্চাশবার বলে চললো পঞ্চাশজনকে সাক্ষী রাখবার জন্যে।

সনাতনকে সবাই চেনে। সনাতন বড় রাগী লোক। বড়-একটেরে আর একগুঁয়ে। সে নিজে যা বোঝে অন্যে তাকে কিছুতে বোঝাতেই পারবে না। এত রাগী এত বদ। সনাতনের বয়েস বড়-জোর পঁয়তাল্লিশ-সাতচল্লিশ হবে। আর আহ্লাদী তার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। অনেক কষ্টে টেনেটুনে সংসারটাকে ভগবানের আশীর্ব্বাদে একটু বড়-সড় করতে পেরেছে। আজকাল দিনে যা কষ্টের সংসার তাতে একা একা আর চলে না তাই বেশী বেশী লোক চাই অন্ততঃ বুড়ো বয়সে নিরাপত্তা বলতে তো ছেলেরা। জমি কিনলে চাষীরা বর্গা বসিয়ে দিচ্ছে। সোনা কিনলে চুরি হচ্ছে। টাকা রাখলে তার কোন দাম নেই। কেননা চৌদ্দ-পনরো বছর আগে একশো টাকার যা দাম আজ আর সেই দাম নেই। সুতরাং টাকা জমিয়েই লাভটা কি। বরং বাবু আট-দশটা ছেলে মেয়ে থাকলে তাদের তখন ছেলেমেদের আদর করতে করতে বুড়োর হাড় জুড়াবো। শান্তি হবে। বড় তৃপ্তি হবে। সেই মোক্ষম শান্তি। সেইজন্যে অনেক বড় সংসার সে করতে না পারলেও তার বউ আহ্লাদী তাকে ছেলেমেয়ে করে মোট চৌদ্দটি সন্তান উপহার দিয়েছে। ইতিমধ্যে চারটি সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। এখন মোট দশজন ছেলেমেয়ে আছে। বড়টির বয়েস বছর চব্বিশেক হবে। সবচেয়ে যে ছোট তার বয়েস হবে চার বছর।

সনাতন ছেলেমেয়েদের নাম কিষ্ট বিষ্টু গোপাল ইত্যাদি রাখেনি। সে ব্যতিক্রম নাম রাখতে চায়। অনেক গোপালের সঙ্গে তার গোপাল এক হয়ে যাবে সেটা মানা যাবে না। তাই সে ছেলেমেয়েদের নাম রাখে বোঁচকা, ছোঁচকা, ফুচকা, হুচকা,

গিরগিটি এইসব।

বাপের জমি বলতে বিঘে দুই সম্পত্তি। বাকীটা শ্বশুরবাড়ী থেকে পাওয়া প্রায় বিঘে চারেক। মোট প্রায় বিঘে ছয়েক জমি। এইসব জমিতে গাধার খাটুনী খাটে বউ ছেলের পঙ্গপাল নিয়ে তাই ধান হয় বেশ। কিন্তু ধানতো রাখতে পারে না। ফলে বাঁয়ে ফেলতে ডাঁয়ে কুলোয় না। যে নেই কে সেই নেই। দু'চার মাস তাকে কিনতে হয়ই। সমবায়ের ঋণ, ব্যাঙ্কের ঋণ, দোকানদানী, ডাক্তার, ভূতে খাবার ব্যামো, ঘোড়া রোগ—সবে মিলে সনাতনের রাষ্ট্রপতির খরচ। তাই তার খরচ পোষাতে প্রজাসাধারণকে পেটে কিল তো মারতেই হবে। সমবায়ের ঋণ আদায়ের বাতিকটাও বেয়াড়া। যখন দাম নেই তাদের ঋণ মেটাও। ফলে আধামূলে বিক্রি হয় ধানের গোলা। ধুর মশাই। ওটা হোল স্বাধীনতার চচ্চড়ি। সবাই নাকি সমবায়ী। হারামজাদা-সুদখোর-ধান্দাবাজ, রাঘববোয়াল সবাই সমবায়ী। সনাতন এসব জানে। একজন তুখোড় আম্‌লার শরীরে যতগুলি গুণ সনাতনেরও ততগুলি গুণ আছে। সনাতনের মস্ত দোষ সে তত লিখতে পড়তে জানে না। বলতে জানে। সবরকম বলতে করতে সে খড়্গহস্ত।

পাইরীকুণ্ডের ওপারে সাতগেছার কাছে তার দু'বিঘা বন্দে গিয়ে দাঁড়াতেই সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। কে বা কারা সারা জমির ধানের ডগ্‌গুলো কেটে নিয়ে গেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার করে জমির আলে আলে ছুটে ছুটে গালাগালি করতে লাগলো। ছুটতে গিয়ে রাগে ক্ষোভে অভিমানে অন্ধ হয়ে দৌড়-ঝাঁপ করতে গিয়ে পা কাটলো শামুক-খোলে। ততক্ষণে অনন্ত এসে তাকে সহানুভূতি দেখালো। সে মন্তব্য করলো: 'সাদিচকের বাগদী ছাড়া আর কে হবে। ও শালারাই ডগ্ কেটেছে।' সনাতন বললো, 'না কাকা ও দুটো-একটা বাগদীর কাজ না। এটা একটা দলের কাজ। নিশ্চয়ই কোন অষ্টমপ্রহর পার্টীর কাজ, না হলে কোন কেলাবের কাজ। আমার কি হবে, কাকা। অতগুলো ধান'—বলেই সে মাথায় হাত চাপড়াতে লাগলো। একটু পরে অনন্ত তার নিজের

জমির দিকে চলে গেল। জমির কোণে খড়গুলো যেখানে জমে ছিল সেখানে কি একটা খস্ খস্ করতেই সাপ বলে মনে হোল তার। হাতের লাঠিটা নিয়ে খড়টা তুলতেই একটা কচ্ছপ দেখা গেল। বাঃ দু'দিনেও তুমি আছ হে শালা। কচ্ছপটা তখনো বুঝতে পারেনি যে তার কাছে এসে গেছে মানুষ নামের হিংস্র জীব। লাঠিটায় উল্টে দিল কচ্ছপটাকে। কচ্ছপ এখন খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে প্রাণপণে পা ছুঁড়তে লাগলো কয়েক সেকেন্ড। লাঠিটা করে একটু ঠুকে দিতেই কচ্ছপ বুঝে নিল শত্রুর হাতে পড়ে গেছে। তাই মরার মতো ভান করে নিজের শরীরকে সে ঢুকিয়ে নিল নিজের মধ্যে।

সনাতনের আজ সব গেছে। সংসারে সাতসকালেই অশান্তি। জমিতে ধান নেই। খালি খড় পড়ে আছে। তবুও জমি তাকে শুধুহাতে ফেরায়নি। সে সের দেড়েক কচ্ছপ নিয়ে বাড়ি ফিরছে। সনাতন বাড়ি ফিরছে তার বাঁ হাতে উল্টানো কচ্ছপ আর ডান হাতে ছোট্ট একটা লাঠি। বুকে তার একরাশ রাগ তাকে নিঃস্ব করে গেছে। কিন্তু কার উপর প্রতিশোধ নেবে। সে নিঃশব্দ হয়ে যায় কিছুক্ষণ।

সনাতনের হাতে কচ্ছপ দেখে সবাই এগিয়ে এলো। বাড়িতে ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরলো তাকে। ছোট ছেলেটা মাকে টানতে টানতে আনলে। দ্যাখো বাবা কী এনেছে। সনাতনকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। কিন্তু মুখ্যু আহ্লাদী বললো, 'শুনেছিনুম কচ্ছপ একসময়ে পৃথিবীকে পিঠে করে ধরে রেখেছিল আর আজ সেই কচ্ছপকে তুমি বাঁ হাতে উল্টে আনছো। তুমি কি শক্তিমান গো।'

সনাতন কিছুই বললো না উত্তরে। মাত্র হুঃ বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কচ্ছপটাকে মাটিতে রাখলো।

বাপের হাতে মার খেয়ে গিরগিটি রেগে আগুন। সে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল তার বাপকে সে মেরে দেবে। যতদিন না ও মরে ততদিন তার শান্তি নেই। মাকে ও মধ্যে মধ্যে মারে। কাজ করতে বলে। জামা কাপড় দেয় না। পড়তে বলে। না পড়লে মারে। তার বাপ একটা মানুষ নয়। গিরগিটি ভেবেছিল, দুপুরে তার বাবা

যখন ঘুমোবে তখন এক ধাঁধা কাদা এনে তার নাক মুখ ঢেকে দেবে। তখন নিশ্বাস বন্ধ হোলে সে মরবেই। মরতে বাধ্য হবে। বেলা গড়িয়ে যেতেই ক্ষিদেয় যখন কুকুর আঁচড়াচ্ছিল তার পেটে তখন তার মাকে বলে মা, ক্ষিদে পেয়েছে। একমুঠো মুড়ি খেতেই কেমন রাগ প'ড়ে গেল। দুপুরে সেও বাপের আনা কচ্ছপ দেখতে কেমন ব্যস্ত হয়ে গেল।

সনাতনের অত সাবান-টাবানের বালাই নেই। এই শীতে ঠোঁট ফাটে গা ফাটে। গায়ের ময়লা চটা করে ওঠে। তাতে তার রাগ হয়। শীতকালের ব্যামোই বটে। আহ্লাদীর মতো তাদের ঠাকুমা কুনোদিনও সাবান মাখেনি। তারা হলুদপাতা পুড়িয়ে ছাইভস্ম মেখে গা পরিষ্কার করত, ছেলেরা নদীর পলি মাখত। তাতেই ধব্‌ধব্‌ করত গা। আবার সাবান পাবে বা কোথা। বিকেলে একজন ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথা উড়িয়ে শয্যা নিয়েছে। তার বুঝি জ্বর হবে। এখন সব সরষের তেল বলে কিছু নেই। একদম মবিলের মতন। উকুন ভদ্‌ ভদ্‌ করছে। বিষ-ফিস্‌ কে মাখায়। কে যত্ন-আত্তি করে। আহ্লাদী বলে, ধুর বাবু আমাদেব সংসারে এভাবেই মানুষ হয়। ওই তো হাজরা ঠাকুরপো চাকরী করে তাদের আয়ও অনেক বেশী। যত্ন-আত্তিও ঢের। কিন্তু তাদের ছেনাদের রোগ লেগে আছে। রোগকে রোগ মনে করলেই বিপদ। তাই রোগকে রোগ মনে না করে মনের জোরে গেলে বন পর্যন্ত ছুটে পালাবে।

সত্যিই বটে, আহ্লাদী এসব মনে করে এই কারণে, যে ওষুধ খরচ করা তো যাবে না। মুখপোড়া ডাক্তাররা এতই ছিনার, ওষুধ শেষ হতে না হতেই ওষুধ বদলে দেবে। টাকা অত কোথা পাই। পাস-করা ডাক্তারের উপর তার বড় ঘেন্না। তারা বলে গু-মুত পরীক্ষে কর। সাঁত কাকার মতো ডাক্তার তো কথনো গু-মুত পরীক্ষা করতে বলেনি। শুধু ফন্দি, গরীব মানুষের পয়সা নুটবার ধান্দা। তার চেয়ে পাড়ার ডাক্তার ভালো। এসব কথা অবশ্য একা আহ্লাদীর নয়। সনাতনও এ কথা বলে। শহরের ডাক্তারের কথা বললেই সে বলবে 'শালাদের

মুখে লাথি।' দালাল। জোচ্চর। শালা বাঁদরের দেশ আর হনুমান তার মাথা।

রাতে বউ আহ্লাদীকে সনাতন সব কথা বলে। তাই আজও বললো, সে আর সেজ ছেলে ফুচকাকে পড়াবে না। সনাতনের ইচ্ছে ছিল বিনা বেতনে পড়ে তাই অন্তত ম্যাট্রিক পাশটা করুক। কিন্তু তা করানো যাবে না। সনাতন বলছে, সরকার তিন পয়সার বেতন ছেড়ে দিয়েছে ঠিকই—বইয়ের দাম আগুন। কাগজপত্র আগুন। স্কুলমাস্টারের বেতন বেড়েছে অনেক, কিন্তু টিউশনির টাকা কার বাপের সাধ্যি দেবে। স্কুলে ছেলেদের তো পড়ায়নি, একদম দেখেনি। প্রাইভেট পড়তে হবে। তাহলে পড়াই কি করে বলো। এখন ফুচ্‌কাকে পড়াতে গেলে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হবে। ও বরং কাল ধান তুলবে। পরে যা হোক কাজ করবেখন।' আহ্লাদী কেমন চুপ করে যায়। সনাতন তাকে আদর করে। তার দেহে সে কোন সুষমা খুঁজে পায় না। কিন্তু কতকালের মোহ আনন্দ বিনোদন তৃপ্তি খুঁজে পায়। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে। দেহের সুষমা খুঁজতেই সে অন্য দেহ খোঁজ করে। যার জন্যে পয়সাও খরচ হয়।

পরীক্ষা দেবার সময় গাঁয়ের সব ছেলে তার বাপ-মাকে নমস্কার করে যায়। প্রথামতো ফুচ্‌কা বাপকে গড় করতে যেতেই সনাতন বললে, 'আজ আর পরীক্ষা দিতে যেতে হবে নি। ধান বইতে যা। মুনিশ কম আছে।' ফুচ্‌কা থমকে যায়। সনাতন বলে চলে, 'মাস্টারকে বলে দোবক্ষণ কাজ আছে পরীক্ষা পরে দিবে।' বলেই সে গরগর করে, 'শালা লেখাপড়া শিখে তো ঢের করবে।'

ফুচ্‌কা তেতে বোম হয়। কিন্তু যদি রাগ প্রকাশ করে তবে সনাতন তাকে হাতের সামনের চাটু নিয়েই হয়তো মাথা ফাটিয়ে দেবে। তাই সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'আচ্ছা যাচ্ছি।' বলেই বাপকে আড়াল করে ঘরের পেছন দিয়ে দে-দৌড়। তার ভাবটা এমন ঃ ধুত্তোর ধান বওয়া আমি চললুম মরগে তোরা।'

কিছুক্ষণ পরে ফুচ্‌কার সন্ধান করতে সনাতন বউকে জিগ্যেস করলো। আহ্লাদী বললো, 'জানিনি। সে তো ইস্কুল যাচ্ছিল।

দেখিনি।' খানকী মাগী ব্যাটাকে দেখনি। পণ্ডিত করবে ছেলেকে। আমি খেটে খেটে খুন হব। রাত্তে তোকে বারণ করলুম। মুনীষ পাইনি খানকীর বাচ্ছারা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে আর তোর ছেনা লাটসাহেব হবে। দাঁড়া তোকে দেখাছি।' বলেই সামনের লম্বা ঝাঁটা নিয়ে উপরো-উপরি দু'ঘা গায়ের জোরে চাপিয়ে দিল। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আহ্লাদী। ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে ককিয়ে উঠলো ছোট তিনটে বাচ্চা।

সনাতনের বউ খুবই নিরীহ। সারাদিন মুখ বুজে কাজ করে যেতে পছন্দ করে। স্বামীর সেবা করতে গিয়ে, তার মনোরঞ্জন করতে গিয়ে একটার পর একটা সন্তান পেটে ধরেছে, একটার পর একটা ভগবানের দান হিসাবেই সে গ্রহণ করেছে। কাউকে সে কোনদিন আপত্তি করেনি। দুঃখের দিনের রুটি ভাগ করে খেয়েছে। হালি মুগ। খেঁচুড়ী। সাবুর আটা। কত কী। সনাতন রাত করে বাড়ি ফিরলে তার জন্যে অপেক্ষা করেছে। গভীর রাতের গাঢ় অন্ধকারে স্বামীকে খাইয়ে শোয়াবার পর নিজে খেয়েছে। সারাদিন এতবড় সংসারের উনুনে জ্বাল ঠেলে ঠেলে সারারাত পরিশ্রমের পরও সংসারের সবার আগে তার ঘুম ভেঙেছে। সে সংসারের সকলের সুখের জন্য শহীদ হয়েছে। যেন শহীদ হওয়াতেই তার তৃপ্তি। সে তবু কাউকে কোন দিন কোন কিছু করতে বাধা দেয়নি। কাউকে কোন দিন তিরস্কার করেনি। তার স্বাদ-আহ্লাদ-ঘৃণা সব তার সংসারকে বৃত্ত করেই রয়েছে। অনেকদিন তার কাপড় জোটেনি। শীতের দিনে মোটা চাদর কিংবা ব্লাউজ বা শায়া জুটেনি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হু হু করে বাতাসে নিজেকে আহত করেছে। প্রচণ্ডভাবে। সবকে সে মেনে নিয়েছে। এসবের পরও যখন প্রতিবেশীর কাছ থেকে শুনতো খালপাড়ের অষ্টমীমনি, পাশের ঘরের গৌরী কিংবা বৃদ্ধস্য ভার্যার তরুণী মালতীর সঙ্গে তার বর সনাতন ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায় তখনো সে বিশ্বাস করেনি। কেননা তার স্বামীকে প্রথম দিন যেমন করে চেয়েছিল ঠিক সে তেমনি করে, সনাতনকে পেয়েছে। তাই লোকের কথায় সে কিছু মনে করেনি। কিন্তু আজ

পৌষ মাসের বৃহস্পতিবার তার সংসারের ছেলেমেয়েদের সামনে অহেতুক অযথা বিনা কারণেই যখন ঝাঁটায় করে দু'ঘা চাগিয়ে দিয়ে গেল তখন তার লজ্জায় রাগে অভিমানে অপমানে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করল। সেই ভয়ংকর সত্যের উপর দাঁড়িয়ে সে আর বাঁচতে চাইল না। সে কাঁদতে লাগল। ক্রমশ দুপুর গড়িয়ে বিকেল। গড়িয়ে সন্ধ্যা। ক্রমশ রাত। রাত ক্রমশ গভীর হোল। সারাদিন কিছু খায়নি। ক্ষিদে পেলো না। সকলকে খাইয়েছে। খেতে ইচ্ছে হয়নি নিজের। সনাতন তখনো ফিরেনি। বাড়িতে ঘড়ি নেই। তাই মাঝরাত্রি হবে মনে হচ্ছিল তার।

রাতে নিশাচর প্রাণীদের অবাধ যাত্রা। তারা যেমন ডাকে তেমন করেই মাঝে মধ্যে শেয়াল ডাকলো। পেঁচা ডাকলো। দূরের বিল থেকে একধরনের পাখী টি-টি করে ডাকলো। দরজা খুলে একটা পেঁচাকে উঠোনের কাপড় মেলা বাঁশের উপর বসে থাকতে দেখে নিজের উপর মায়া হোল। তবুও সে মুখ আর দেখাবে না প্রতিজ্ঞা করে নারকেলগাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। তখন রাতের চাঁদ কেমন হেলান দিয়ে দেখছে যেন তাকে। অশ্চর্য লাগছিল তার। কোলের বাচ্ছাটা তখন তার বিছানায় মাকে খুঁজে না পেয়ে কেঁদে উঠলো। আহ্লাদী আর এভাবে দাঁড়াতে পারলো না। কে তাকে বুকে যেন হাতুড়ী মারলো। বললো, 'যা ঘরে যা।' তাড়াতাড়ি ঘরে এসে ছেলেকে বুকে নিয়ে কেঁদে বললো, 'এই যে বাপ্ এসে গেছি। ভয় নেই। ভয় নেই।' ছেলে বললো, 'মা হাগ্‌বো।'

…চা-দোকানে রেখে গেছে গিরগিটিকে। গিরগিটি বেশ মিষ্টি ছেলে। সে ফিক্ ফিক্ করে হাসে। আর তুক্ তুক্ করে তাকায়। কালোপারা ছেলেটা। বছর দশেকের—সবাইকে সে আকর্ষণ করে। বেশ। বেশ। গিরগিটির কেমন ব্যতিব্যস্ততা। জল দেয়, চা দেয়, ডিস্ ধোয়। গেলাস ধোয়। মাঝে মাঝেই রাগ হয় তার। ঘরে তো এসব করত না কখনো। মা করতো। এখানে এসব করতে হয়। তবুও তার মালিক তাকে গিজ্ গিজ্ করে। ফাইফরমাসের শেষ নেই। হ্যান কর। ত্যান কর। কত কি।

করবার আর শেষ নেই। তাই তো। কোন কোন খদ্দের তার বাপের নামে গালাগালি করে। মায়ের উদ্দেশ্যে যা-তা বলে। সে তাদের মারতে পারে না। রাগ জমে। ইচ্ছে করে থুথু দিয়ে দেয় গায়ে। কিন্তু দিতে সাহস হয় না। সামনে দিয়ে ছেলেরা মেয়েরা সাজগোজ করে ইস্কুলে যায়। মন কেমন করে। কি করে এদের পাঠায় ইস্কুলে এবং প্রশ্ন জাগে কেন তাকে কোনদিন আদর করে স্কুলে পাঠায়নি। কষ্ট হয় তার। মায়ের সাথে বাপের সাথে ছেলেরা চা-দোকানে বসে চপ খেলে ডিম খেলে তার মনে পড়ে তার মা তো কোনদিন এভাবে খায়নি। মায়ের সঙ্গেও খায়নি। সে দেখতে দেখতে কেমন হাঁ হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তখন কোন কোন ছেলে তার মাকে বলে, 'দেখো দেখো ছেলেটা কেমন করে তাকিয়ে আছে।' মেয়েটি তখন উদ্দেশ্য করে বলে, 'আপনি কি ছেলেটাকে খেতে দেননি। সে হা করে তাকিয়ে আছে।' সটান আর কিছু না বলে চপেটাঘাত করে গিরগিটিকে। মনটা কেঁদে উঠে। ককিয়ে ওঠে।

মালিক খেতে দেয়। ওরা সব একসঙ্গেই খায়। মালিক খায় মাথা. গিরগিটি আঙ্গুল চুষে। পেট ভরে না। একটু বেশী ভাত চায়। পায় না। মালিকের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ থাকে না। বলে, কি রে, ভাত নিবি।' ভয়ে সিটিপিটিয়ে থাকে। ডিস্ চেটে পরিষ্কার করে আঙুল চুষে। নুন। নুন। নোনতা স্বাদ। মালিকের অলক্ষ্যে ঘাড় নাড়ে, মালিক দেখে না। পেট ফরে যায় মালিকের। ভীষণ আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠে। পাতের ভাতগুলো শেষ করতে পারে না। ঘরের বউ-এর উদ্দেশে দু'টো খেউড় গেয়ে দেয়। তারপর গিরগিটিকে বলে যা যা উঠে যা ভাবনা নেই। আমি উঠছি। আমার জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। ধুয়ে নিচ্ছি। . কতক সময় বাড়তি ভাত পেটের ক্ষিদে থাকা সত্ত্বেও ফেঁতি কুত্তোকে 'দিতে হোত। মালিকের নির্দ্দেশ মতো। নিজের পেট ভরাতো না। গিরগিটি রাগতো, কিছু বলতো না। সাহস হোত না তার। কেননা তার বাপ বলেছে ঘর পালানো চলবে না। তাহলে কচ্ছপের মতো

কেটে ফেলবে।

সাত আটবার পায়খানা করে হাত পা লিট্‌পিট্‌ করছিল গিরগিটির। একদম লিটপিট করছিল। মালিক বললে, 'ধুর শালা' আমার একবার ছাপান্নবার পায়খানা আর তেষট্টিবার বমি করবার পরও সারাদিন দোকান চালিয়ে গট্‌গট্‌ করে হেঁটে চলে গেলুম। তুই শালার ছেনার কি এমন আমবাত বের হোলরে যে কয়লাটা ভাঙ্গা যাবে নি। দু'বালতি জল তোলা যাবে নি। তোর বাপ জল বয়ে দেবে? যা কয়লা ভেঙ্গে ফ্যাল। গিরগিটির করা গুরুত্ব পেল না। কয়লা ভাঙ্গতে গিয়ে মনে হোল সে যেন আবার হেগে ফেলবে। আবার ছুটলো। উঠে আসবার সময় মনে হচ্ছিল যে পড়ে যাবে। একবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো মাত্র দু'বালতি জল তুলে দিয়ে সে পালিয়ে যাবে। বালতি নিয়ে জল আনতে গেল। বালতি ভর্ত্তি করলো ধীরে ধীরে। পাশের দোকানের যীশু বললে 'গিরগিটির শরীর খারাপ নাকি রে?' কোন কথা বলতে পারলো না। হঠাৎ অন্ধকার দেখলো চোখে। তারপর কেমন করে সে যেন পড়ে গেল বালতি ভর্ত্তি জল নিয়ে। অতিকষ্টে দিনযাপনের প্রতিশোধ নিতে গিরগিটি যেন নিজেরই তোলা জল নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘৃণ্য মানুষের পায়ের ধুলোকে ধুয়ে পরিস্কার করে দিলো। সেই জলে কাদায় পড়ে রইলো গিরগিটি। তার মা তার বাবা এই মুহূর্তে এখবর জানে না। যখন জানবে তখন তারা কাঁদবে কিনা কি জানি। গাছের ফল সব মানুষের ভোগে আসে না বলে তৃপ্তিও পেতে পারে।

গিরগিটি যখন চোখ মেলল তখন দেখলো সে খাটে শুয়ে আছে। সুন্দর ঘর। আলো পাখা। সুন্দরী মেয়ে। তার ডান হাতটা বাঁধা। কি একটা ছোলানো আছে বোতল। একটা সুঁচ বিঁধে রেখেছে। পাশেই একটা বীভৎস পোড়া মুখ তার দিকে তাকিয়ে। ভয় পেতো কিন্তু পেলো না কেননা সেখানে অনেক লোক আছে। তার মনে হোল সে বুঝি হাসপাতালে। তার খাটে অন্য কেউ নেই।

ইদানীং হাসপাতালের হাস উড়ে মানস সরোবরে চলে গেছে। সুতরাং পাতাল পড়ে আছে চুপচাপ। ওয়ার্ড মাস্টার রাঁধা মাছ, তরকারী পাচার করে। ঘুষের পাহাড় ওখানে। পেছনের গেট দিয়ে রাধুনীরা মাছ মাংস পাচার করে। জি. ডি. এ.-রা এদের সঙ্গে বেশ যুক্ত। সিস্টাররা যা করে তা আরো নোংরা। ওষুধ মেরে দেয়। ডাক্তার মারে। সিস্টার মারে। অপরেশন টেবিল থেকে যন্ত্র হাপিস হয়। কাঁচ ফাটিয়ে দামী ওষুধ চলে যায়। তাতে কর্মচারীদের নেতা থাকে। হাতা থাকে। চুরি করা পড়ে। শাস্তি মাফ করবার জন্য সবাইকে সুপারিশ করে। হাসপাতাল একটা জুয়াচোরের আড্ডা। হাসপাতাল একটা অসভ্যতার আড়ত হাসপাতালে ভ্রষ্টাচারের ন্যাকরামি দিন দিন বেড়ে ওঠে। এরই মধ্যে গিরগিটি নাকি সুস্থ হবে। কোন পাগল ছাগল ডাক্তার গিরগিটিকে খুব বকে দিয়ে গেছে মালিকের কথামতো। নার্সও।

আহ্লাদী বক্না বাছুর নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সে কেঁদেছিল বলে সনাতন বলেছে ভয় নেই গিরগিটি ভাল আছে। মালিক তাকে সিগ্রেট খাইয়েছে। চা খাইয়েছে। সনাতনের খুব ফুর্তি। গিরগিটির মালিক তাকে চা দেয়। সিগ্রেট দেয়। সে বড়াই করে তার ছেলের জন্য, সে এমন ছেলের বাপ যে ছেলে প্রাণ থাকতে জান দিয়ে কাজ করে। খুব ভাল লাগে বাপের।

বাড়ির দেওয়ালে বন-সৃজনের একটা পোস্টার দেখে তার চোখ আট্কে যায়। চমৎকার একটা পোস্টার। 'একটি গাছ একটি প্রাণ। আপনার সন্তানের মতো।' লেখাটা সে পড়তে পারে না। অন্যরা পড়ে দেয়।

···গিরগিটি দ্যাখেসন্তান তো অবহেলার পাত্র। একটা ছাগল-বাচ্চা যত আদর পায় একটা মানুষের বাচ্চা তত আদর পায় না। বরং বক্না বাছুরের চেয়েও অবহেলার পাত্র সে। পোস্টারটা ছেঁড়ার চেয়ে গোবর লাগিয়ে প্রতিবাদ করাই উচিত মনে ক'রে এক খাঁধা গোবর লাগিয়ে দিল। মা আহ্লাদীর বকাবকি সে শুনল না।

দুপুরে মাঠ থেকে ফিরে সনাতন দেখলো তার সখের পোস্টারে

গোবর লাগানো। জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল সে। চোখ তেড়ে জিগ্যেস করল, 'পোস্টারে কে গোবর লাগিছে?'

আহ্লাদী হুঁ-কুঁ করল না।

কাঁচকলার ঝোল মেখে গিরগিটি ভাত খাচ্ছিল। সে কোন কথায় কান করল না।

প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাতের শব্দে গালে ভাত নিয়ে গিরগিটি ককিয়ে কেঁদে উঠল। পর পর আরো কয়েকটা শব্দে-প্রতিশব্দে ক্ষুধার্ত দুপুর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

রাত কতটা পল্‌তে বুঝতে পারেনি। ললতে আর অন্যান্যরা সবাই শুয়ে পড়েছিল। আশ্রমের মাদার রানী দত্ত আর তার ছেলে শোবার ঘরে জেগে ছিল। পল্‌তেও জেগে ছিল।

রাতে তার ভাগে পড়েছিল দু'টো করে সেঁকা রুটী আর একটু করে আলুর দম্। পেট-ভর্তি জল খেতে দিয়েছিল সবাইকে। দুপুরবেলাতেও এই জনপদ অনাথ আশ্রমের বত্রিশজন ছেলের পেটে পেট পুরে ভাত জুটেনি আজ। অবশ্য মাদার রানী দত্ত'র একমাত্র ছেলের কথা বাদ। সে প্রতিদিন অনেকখানি বেশী পায়। দেখিয়ে এবং লুকিয়ে।

জনপদ অনাথ আশ্রম তৈরী হয়েছিল দশ-বারো বছর আগে। এক নিঃসন্তান ভদ্রমহিলা নিতান্ত আবেগ আর উচ্ছ্বাসেই কিছু সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতা নিয়ে মফস্বল শহরের প্রান্তসীমায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তৈরী করেছিল এই প্রতিষ্ঠান।

বাপ-মা-মরা ছেলেরা এসেছিল এখানে একমুঠো খাবে আর লেখাপড়া শিখবে। প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগ নিয়ে প্রথম প্রথম গ্রাম শহর থেকে টাকা ভিক্ষা করে চললেও পরে সরকারী অনুমোদন করে নিয়েছিল। ফলে টাকার অসুবিধা হয়নি তখন। জনপদ আশ্রমে সেই মেয়েটি যতদিন ছিলেন ততদিন কোন অসুবিধা তো হয়ইনি, বরং মায়ের মতো দেখতেন ছেলেদের। তিনি পরম মমতায় ছেলেদের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিতেন।

কিন্তু কখনো কখনো সময় বড় বেমানান হয়ে পড়ে। দায়িত্ববান লোকেদের প্রতিষ্ঠানে আসা উচিত কিন্তু কখনো কখনো দায়িত্বহীন লোকেরা এসে পড়ে ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। যেমন করে

বীণা ছিঁড়ে ফেলে বানর ঠিক তেমন করেই ছিঁড়ে যাচ্ছিল আশ্রমের তারধ্বনি।

রাতে খাবার সময় সবাইকে সতর্ক করে নাইটকাকু কেষ্ট হাজরা জানিয়ে দিল—'আশ্রমে দারুণ সংকট। এখন একটু কষ্ট করে চলতে হবে আমাদের। সরকারী অনুদান এখনো এসে পেঁছায়নি। ফলে ধারবাকি ভীষণ হয়ে গেছে। কেউ আর ধার দিতে চাচ্ছেনি। ভূষিমাল, ডাক্তার কাপড়ের দোকানের ঠিকাদার। সবাই একই সঙ্গে চীৎকার করছে। তারা টাকা না পেলে পুনরায় দিতে পারবেনি। চাল সরবরাহ বন্ধের মুখে। গম দিতেও চাইছেনি। ফলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। খেতে পাবেনি প্রায়। ক'দিন কষ্ট তো হচ্ছেই। আর ক'টা দিন আমাদের কষ্ট করতে হবে।' ছেলেদের নাম ধরে বললে, 'কি রে, হারু-লখে-নিতাই-গৌতম ক'দিন কষ্ট করতে পারবিনি?' কথাগুলোয় ছেলেরা একটু আশ্চর্য হচ্ছিল। রান্নাঘরের চাল কেন কমে, কেন যে খাবারদাবার কমে যায় তা তারা আন্দাজ করতে পারে না। তবে কয়েকবার নাইটকাকু কিংবা মাদার কী সব নিয়ে যেতো। যে গয়লা দুধ দিতো তাতে থাকতো জল। যে মাছ-মাংস দিতো তাকে ছেলেরা মাঝেমধ্যে দেখতো, এবং ছেলেরা ঝোল পেলেও যে মাছ-মাংস খুব পেয়েছে তা নয়। তাই পল্‌তে বললে, 'নাইটকাকু, কী রকম কষ্ট করতে হবে বললেন না তো।'

কিষ্ট হাজরা বললে, 'তেমন কিছু নয়। ক'দিন পেট ভ'রে খেতে দিতে পারিনি তো। এরকমটা আর ক'দিন চলতে পারে। সকাল ন'টায় ভাত খেতে দোব আবার সন্ধ্যায় রুটী দোব। এর বেশী পারবনি।' পল্‌তে হেসে ফেলে বলে, 'আমার বাপ-মা থাকলে তারাও একই কথা বলতো।'

লল্‌তে বললে, 'বিলাস মামা তো বলবে, আপনি বলছেন কেন?' কিষ্ট হাজরা একটু ক্ষুণ্ণ হোল মনে মনে। সে তো তিনশো টাকার চাকর তবে সে বলবে কেন? ভেতরে ভেতরে গালাগালি দিল ছেলেটাকে: 'আঁটকুড়ীর বাচ্চা বলে কি রে। এ যে আইনের প্রশ্ন।' কিষ্ট হাজরা থেমে গেল।

মাদারকে সবাই 'মাদার' বলে। রানী ব'লে কেউ ডাকে না। তবে ছেলেরা সবাই জানে আশ্রমের মায়ের নাম। রানী দত্ত। তার একমাত্র সন্তান শম্ভুনাথের বয়েস চোদ্দ-পনের বছর হবে। সে কবে বিধবা হয়েছে, কেন হয়েছে কিংবা বিধবা হোলে তাদের কী অসুবিধা এসব কিছুই জানে না ছেলেরা।

আশ্রমের আইন অনুসারে রানী দত্ত মাদার হলেও ছেলেদের কাছে 'মা' হতে পারেনি। সে একটু রগচটা আর অস্থির। রানী দত্ত কেন মায়ের ভূমিকায় অথচ মা নয় আশ্রম চত্বরের প্রতিবেশীদের কাছে এসব খবর কানাকানি হয়ে গেছে। সাধারণ ভাবে রানী দত্ত সন্দেহ বাতিক আর সব কিছুতে চক্রান্তের আঁচ করে।

মাদার লল্তের মুখে মুখে চোপ্রা করার মতো সাহসের কথা শুনে রেগে গেল। একটা বেত নিয়ে সপাং করে প্রায় হঠাৎই লল্তের মাথা বরাবর বসিয়ে দিলো।

যন্ত্রণায় চীৎকার করবার সঙ্গে সঙ্গেই লল্তের মাথাটা ঘুরে গেল। প'ড়ে গেল লল্তে। চুলের ভেতরটা গেল কেটে। রক্ত পড়তে লাগলো ঝর্ ঝর্। গোঁ গোঁ করতে লাগলো সে।

সব ছেলেরা মুহূর্তের মধ্যে নিঃশব্দ হয়ে গেল। পল্তে ভয়ে প্রায় আঁৎকে চীৎকার করে উঠলো—'মরে গেছে গো মরে গেছে গো—' কিষ্ট হাজরা বলল, 'জল আন্ জল আন্।' ছেলেরা দৌড়ে জল আনল। মাথায় ঢালা হোল। হারু-নিতাই-গৌতমরা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ রা-টি কাটল না। একদিকে ভয় করছিল তাদের, মাদার যদি তাদেরকে আবার প্যাঁদায়। কে সামলাবে। এরকম ঠেঙান বেড়ান তো হামেশাই হয়। একটা বীভৎস নিস্তব্ধতার মধ্যে হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপতে লাগল রক্ত দেখে।

মাদার নিজেই ছুটে গিয়ে অফিস ঘর থেকে ব্যাণ্ডেজ আর অন্যান্য ফার্স্ট-এইড আনলো। রক্ত থামলো না। ব্যাণ্ডেজ করা হোল। ব্যাণ্ডেজ পুনরায় ভিজতে লাগলো। কিষ্ট হাজরা তার কিছুতেই দাঁত ছাড়াতে পারছিল না। তিন ঘটি জল খরচ করা হোল। 'গোঁ' 'গোঁ' শব্দের মধ্যেই কিষ্ট বললো, 'নিত্য, যা

দেখি একটা ট্রলি-রিক্‌সা যাকে হোক ডেকে আন দেখি। হাসপাতাল নিয়ে যাব।' উদ্বেগ ছড়িয়ে বললো। মাদার নিত্যকে ধমক দিয়ে বললো, 'এই খবরদার কারো কাছে যাবি না।' সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে প্রায় ভিরমী খাওয়ার মতো হয়ে কিষ্ট হাজরাকে বললো, 'কিষ্টদা, হাসপাতাল ডাক্তার-ফাক্তার দিয়ে ঝ্যামেলা কোরো না, দাঁতিটা ছাড়িয়ে দাও। তুমি যা চাইবে তাই দোব। বাঁচাও ছেলেটাকে, না হলে মরে যাবে যে। মরে গেলে শম্ভুনাথের কি হবে? আমি তো একটু আদর করে শাস্তি দিতে গিয়ে···।' কথা শেষ করতে পারল না। ভয় পেল।

কিষ্ট হাজরা নাইটগার্ড হলেও তার বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশের বেশী কিছুতেই নয়। দোহারা গড়ন। মাঠে ঘাটে দিনের বেলায় কাজ করে। রাতে আশ্রম পাহারা দেয়। পাহারা দেওয়া তো নয়। দরজায় খিল দিয়ে ঘুমোনো। ছেলে চুরি মেয়ে চুরি যাতে না হয়। দিনের বেলায় গাধার খাটুনী খেটে রাতে রাত-জাগা তাও আবার বৌ-ছেলে ছেড়ে কেমন একটা অস্বস্তিকর। দ্বিধান্বিত হয়ে ওঠে, মাঝেমধ্যে মাদার রানী দত্ত যখন ভীষণ একাকিত্ব নিয়ে হাজির হয়। তখন তার মনে হয় কে কাকে পাহারা দেবে। কে কাকে বাঁচাবে। এই অনিবার্য সত্যের কাছে রানী দত্তকে অনেক রাত্রে অনেক কাছের লোক দেখেছে। অনেক ভাবে দেখেছে। একটু সাজগোজ একটু পরিচ্ছন্ন একটু ছিম্‌ছাম দেখে কিষ্টর মনে যে কোন উথালপাতাল খায়নি তা নয়, কিন্তু কিছুতেই সাহস হয়নি। আজ এই বিপদের রাতে নিতান্ত অসহায় হয়ে রানী দত্ত যখন বললো, 'তুমি যা চাইবে তাই দেব'—কথাটা শুনে কিষ্ট কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেকে অবিশ্বাসী মনে করলো যে কি চাইতে পারি আমি? কী দিতে পারে সে! কোন্‌ চাওয়াটা তার কাছে বুদ্ধিমানের হবে।

কিষ্ট হাজরার মনে মনে এখন আকাশকুসুম কল্পনা খেলতে শুরু করেছে কিন্তু মাদার রানী দত্তর যে আবেদন 'ছেলেটাকে বাঁচাও' শুধুমাত্র সেই কারণেই সে লল্‌তের চোখে জলের ঝিটা দিতে লাগলো। অনাথ আশ্রমের মা-বাপ লল্‌তের মুখে জল দেবার সময়

মনে হোল তার ছেলের যদি কোনদিন এমন হয়। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। ডাকতে থাকলো 'লল্‌তে—লল্‌তে—।' রানী দত্ত ভাবছিল ছেলেটা যদি মরে যায় তাকে জেল যেতে হবে। যদি মাথা ফাটার কথা সম্পাদক-বাবু জানতে পারে তাহলে মাদারের চাকরী যেতে পারে। যদি প্রতিবেশীরা জানতে পারে তাকে সবাই তিরস্কার করবে। কিন্তু লল্‌তের পঞ্চায়েত যদি জানতে পারে, যদি ডাইরী করে তবে তো হাজত খাটতে হবে। রানী দত্তর বুক শুকিয়ে সুপারী হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত করছে। কিন্তু কিষ্ট হাজরা যখন প্রাণপণে চেষ্টা করছে আর বলছে, 'তোমার কুনো ভয় নাই আমি আছি তো—।' তখন কিষ্ট হাজরাকে দারুণ ভাল লাগছিল তার। কিষ্টও তো জোয়ান। তার বরও জোয়ান ছিল। অবশ্য কিষ্টর চেয়ে তার বর-এর গায়ের রং ছিল ফর্সা। কিন্তু লোকটার কোন আক্কেল ছিল না। তাই তাগাদা মরে গেল। কিন্তু সে যে মরল তার জন্য তাকে টিউবেক্‌টমি করালোনি কেন? এখন সে কেমন করে বাঁচবে। তার শরীরে জ্বালা ধরে। রাতের পর রাত তার মনে হয় তার শরীরটাকে কেউ দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিক। তার বরের উপর রাগ হয়। কিষ্টর দিকে আগ্রহে তাকায়। কিষ্টর চোখে চোখ পড়ে। ভেতরে ভেতরে কেমন অফুরন্ত আনন্দ এসে হাজির হয় দু'জনের মনে। নিতাই দেখে। হারু দেখে। গৌতম দেখে। পল্‌তে ভেউ ভেউ করে কেঁদে চলে।

গৌতম বলে, 'পল্‌তে চুপ কর। ভয় নেই। মাদার আছেন। কাকু আছেন।'

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে লল্‌তের। গা থেকে দর্‌দর্‌ করে ঝরে যাওয়া ঘাম ঠাণ্ডা হতে থাকে। পল্‌তে কাছে আসে, পাখার হাওয়া করে। গৌতম তার পাশে বসে পড়ে। নিতাই দ্যাখে। দেখতে থাকে। কিষ্ট হাজরা রানীকে জিজ্ঞেস করে, 'ভয় কাটলো?' মৃদু হাসে কিষ্ট। 'কুনো ভয় নেই।' লল্‌তেকে শুইয়ে দেওয়া হোল ঘরে। ছেলেদের সরিয়ে দেওয়া হোল। নিতাই কাছে রইল।

রানী যেন বাঁচলো। হাসলো। বললো, 'ধন্যবাদ।'

কিন্টু হাজরা বললো, 'দাও—।'

মাদার বললো—'কি ?'

—'ঐ যে তুমি দেবে বললে। যা চাইবো তাই দেবে।'

—'তুমি কি চাইছো তা তো জানতে পারিনি। তুমি চেয়ে নাও।' চোখে মুখে একটা অস্পষ্ট কথা যেন ভাসতে লাগলো। কিন্টু হাজরার সেই কথা বুঝতে কষ্ট হোল না ; বললো, 'এখন থাক্ পরে চেয়ে নেব। তবে কাজটা তুমি ঠিক করোনি।' রানী ওর হাতটা ধরলো ; বললো, 'তোমার পায়ে পড়ি ওদের বোলো না। আমাকে বাঁচাও।'

কিন্টু বললো—'কথা রাখবে তো ?'

রানী বললো—'দেখে নিও।'

রাত্রি অনেক হয়েছে। লল্তের ঘুম আসছে না। মাত্র দু'টি রুটী চিবোনার পর এই মার-অত্যাচার মাথার যন্ত্রণায় ক্ষিদেয় মন্থর হয়ে আসছিল তার শরীর। সে জেগে যাচ্ছিল সবসময়ই। ঘুম কিছুতেই আসছিল না। একটু জলতেষ্টা পাচ্ছিল। গা-টা গরম গরম লাগছে। জ্বর হোল বুঝি। বিছানা ছেড়ে উঠলো। সোজা দাঁড়ালো। মাথাটা ভারী লাগছিল। রান্নাঘরে জল খেতে গেলে ঘর পার হয়ে যেতে হয়। কেউ জেগে নেই। মাদারের ছেলেও জেগে নেই।

দরজার কাছে যেতেই মাদার-এর ঘরে মচ্ মচ্ শব্দ পাচ্ছিল। যে শব্দ কোনদিন পায়নি। কৌতূহল হোল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। রান্নাঘরে ঢুকে জল খেলো। কিন্তু দরজার পাশের ঘরে নাইটকাকু যে প্রতিদিন ঘুমোয় তাকে কোথাও দেখা গেল না। জানালার উপরের পাল্লা ছিল আড় করে খোলা। আবছা আলো। দেখবার চেষ্টা করল সে। যা দেখলো তা সে কখনো দেখেনি। হাত লেগে পাল্লাটা নড়ে যেতেই ভয় পেয়ে চলে গেল।

অনেক জ্বর! বিছানা থেকে উঠতে পারল না লল্তে। পল্তে

তার কাছে এসে বসলো। শ্রীপুরের ৺জীবন মাইতির যমজ ছেলে লল্‌তে-পল্‌তে যেন অযাচিত ভাবেই এই পৃথিবীকে কৃতার্থ করবার জন্য জন্মেছে।

এই অসহায় সঙ্গীতহীন অসঙ্গতির জীবন যাপন করে বলে কত লোক এদের কত রকমের দয়া দেখায় ঘৃণা করে আদিখ্যেতা দেখায়। এদের দেখ্ ভাল্ করে যারা সুস্থ জীবন যাপন করে চাকরী করে মাইনে পায় তারা এদের কে আশীর্ব্বাদ ব'লে মনে করে না। ঘেন্না করে। তারা এদের দয়া করবার আস্পর্ধা দেখায়। অথচ তাদের দয়ায় এরা বাঁচে না এদের—বাঁচানোর দায়িত্বটা তারা দয়া ক'রে পায় বলেই তারা বাঁচে।

পল্‌তে বললো, 'দাদা, তোর কি খুব জ্বর হয়েছে ?' গায়ে হাত দিল। খুব গরম।

লল্‌তে বললো, 'ভীষণ গা-হাতের যন্ত্রণা করছে। গা-টা টিপে দেনা ভাই।'

পল্‌তে গা টিপে দিল। লল্‌তে বললো, 'নাইটকাকু কোথায় রে ?'

পল্‌তে বললো, 'জানি না।'

লল্‌তে বললো, 'নাইটকাকু রাতে মাদারের ঘরে থাকে। কেন কি জানি। পল্‌তে তোর রুটী আছে ?'

পল্‌তে বললো, 'মাত্তর দুটো রুটী। কৈ নেই তো।'

—'খুব ক্ষিদে পেয়েছে।'

—'দাঁড়া। মাদারকে বলি।'

রানী দত্ত দাঁত মাজছিল। বললে, 'কি ব্যাপার বাবু যে।'

—'মা দু'টো রুটী আছে ? দেবেন ? লল্‌তের ক্ষিদে পেয়েছে।'

—'উঃ আমার লাটসাহেবের বেটা রে বাপের সম্পত্তি এনে বসেছো ভোর না হতেই রুটী। যাঃ পরে হচ্ছে।'

পল্‌তেকে ভীষণ রাগ ধরলো। মাদার ভাল কথা বলতে শিখেনি। সে ভাবতে থাকলো আমরা তো বত্রিশজন। ওর ছেলে খাবে কেন ?'

পল্‌তে বললো, 'দাদার জ্বর। কালকের কাটার জায়গাটা

যন্ত্রণা করছে।'

রানী দত্ত রেগে বললো, 'আমাকে বলতে এসেচ কেন ? ড্যাংগুলি খেলতে বারণ করলে কথা শুনিস ? ড্যাংগুলি খেলে মাথা কাটবি আর তার খেসারত গুনবো আমি। একে আশ্রমের টাকা নেই। দেনা। তোদের চক্রান্তের জ্বালায় কি আশ্রম বন্ধ করে দোব !'

পল্তে বললো—'কাল রাতে তো আপনি মেরে ওর মাথা ছেঁদা করে দিয়েছেন আর আজ বলছেন ড্যাংগুলি।'

মাদার রাগে ফুঁসে উঠলো। বললো—'দেখলে দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি! আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত! আচ্ছা, তোদের আশ্রম থেকে অবশ্যই তাড়াবো। দাঁড়া—তেল তোদের ভাঙতে হবে।'

এসব কথার মানে বুঝতে পারল না পল্তে। আট-ন'বছর বয়েস লল্তে-পল্তের। তারও ক্ষিদেয় গা টল্ টল্ করছিল।

আট-ন'বছরের মুখ চলে হাঁসের মতো। শরীরের বাড়বার সময়। তাদের মুখ এসময় সবসময়ই চলে কিন্তু খাবার নেই পথ্য নেই। পল্তের মনে রাগ হয় মাদারের ছেলে এত খায় কোথা থেকে। ভাত কম পড়বে ব'লে একচাটু-দু'চাটু করে কম করে ভাত খাওয়ায় আর সেই ভাত থেকে টিফিন-ক্যারিয়ারে কোথায় যায়। মাদারের হাতে যায়। নাইটকাকুর হাতে যায়। কেন যায়। নিতাই দ্যাখে গৌতম দ্যাখে। হারু দ্যাখে।

মফস্বল শহর কিন্তু গরীব নয়। যার আছে তার কোটী কোটী টাকা আছে। সোনা আর কাঁচা টাকার পাহাড় এদের ঘরে। আয়কর হানা দিলে এদের কাছ থেকে সরকার যা পায় তার চেয়ে বেশী চুরি করে নিয়ে যায় অফিসারেরা। এদের কত নেবে।

এবারে সার কারবারে এদের সোনা ফলিয়ে গেছে। রাজনৈতিক দল, কৃষক-দরদীর দল গা চুলকাচ্ছিল আর ওরা লুটে নিচ্ছিল চাষীদের হাড়গোড়। এই শহরের মালিকের সঙ্গে কর্মচারী কলকাতা গেলে বাজে খরচ করবে হাজার টাকা আপত্তি নেই। কিন্তু রুটীর জন্য দশ টাকা ধার চাইলে ধার দেবে না। পঁচিশ টাকা বেতন বাড়াবার

জন্য একমাস ধর্মঘট ডাকতে হবে। গণ্ডগোল করতে হয়। অথচ এরা এ্যাবোরশনে অর্থ অপচয় করে চুল্লুতে বঁুদ হয় প্রতিদিন, কিন্তু চোখের সামনে এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছে না। শহরের কি লজ্জা! ছোট একটা পুচ্কে শহর মাত্র চল্লিশ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটা বেশ্যাখানা একশো বছর পুষে রাখতে পারলো অথচ অনাথ আশ্রমের জন্য কারো কোন মাথা ঘামলো না। শহরের বন্ধুরা ব্যবসায়ীরা আর চাকুরীজীবিরা যারা বৌ আর বৌ-এর মতন অন্য মেয়ে নিয়ে মেতে রয়েছে নিয়ত—যাদের পেট ভর্তি রাখবার জন্য গরীব মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দেশের সরকার মাস-মাইনের নামে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তুলে দিচ্ছে সেই হিংস্র খল-আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলোর ন্যূনতম মাথাব্যথা হোল না কেন কেউই বুঝে উঠতে পারল না।

শুয়ে-শুয়েই লল্‌তে বললো, 'ক্ষিদে পাচ্ছে। মাথা ঘুরছে। গা টলছে কেন নিতাই? পল্‌তেকে ডাক-না।'

নিতাই কানে কানে বললে, 'সে নেই। সে বাইরে গেছে।'

গৌতম বললো—'বিলাস মামাকে ডাকব?' সে আসবে?

নিতাই বললো—'ডাক-না।'

গৌতম বাইরে চলে গেল। বেলা বারোটা অনেকক্ষণ বেজেছে। গৌতমের গা গুলাচ্ছিল ক্ষিদেয়। রান্নাঘরে তখনো ভাত চড়েনি। নিতাই দেখল মাদার কী খাচ্ছে। মুখ নড়ছিল। নিতাই বললো—'মা, আমাদের একটু দাও না—ক্ষিদে পেয়েছে যে।' মাদার তেড়ে এলো।

অন্য কোন ছেলে আশ্রমে ছিল না। শুকনো মুখে আশ্রমের বাইরে চলে এসেছিল। রাস্তার উপর পরিচিত লোকদের কাছে পয়সা চাইছিল।

জনপদ আশ্রমের সম্পাদক বিলাস চক্রবর্তী সরকারী চাকরী করে। মহকুমার নেতাও। বিরাট নাম। চুরি-জোচ্চুরি-বক্তৃতা ধাপ্পাবাজী সবেতেই তার সুনাম। সে জানে দায়িত্ব মানে ইনকাম।

ইনকাম মানে ব্যবসা। ব্যবসা মানে 'লুটে খৈ গোবিন্দায় নমঃ,। আশ্রমের কি হবে না-হবে সে পরের কথা, টাকা—শেষ করলেই টাকা। সুতরাং ক্যায়া চিন্তা। ঢালো। এই করেই টাকা নয় ছয় করে খাতায় হিসাব তুলতে পারেনি। আজ ছ'মাস হিসাব জমা দিতে পারেনি বিলাস চক্রবর্তী। 'সরকার কা মাল দরিয়া মে ঢাল' করে সরকারী অর্থের অপচয় রোধ করে নিজের ঘরের মেঝে প্লাস্টার করে নিল।

লল্তেকে শুতে দেখেই জিগ্যেস করল—'কী ব্যাপার? মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?'

মাদার পড়ি মরি করে ছুটে এসে জানালো, 'ড্যাংগুলির চক্রান্ত।' নিতাই চুপ করে রইল। কিন্তু রাগে গর গর করতে লাগলো। বিলাস চক্রবর্তীর কোন সহৃদয় কথা শোনা গেল না। শুধু বললো, 'মরগে যা—'। মাদারের দিকে চেয়ে একটু হাসলো বিলাস চক্রবর্তী। একটু মৃদু হাসলো, বললো, 'চাল আছে?'

মাদার বললো, 'চাল নেই।'

—'খাবে কী?'

—'চালটা কিনে দিন। টাকা কি সত্যিই নেই? হিসাবে বলছে আপনার কাছে অনেক টাকা আছে।'

—'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

রানী দত্ত বললো, 'জানি।—একবার ঘরে আসুন।'

বিলাস চক্রবর্তী ঘরে ঢুকে খাতা দেখতে লাগলো। তাদের মৃদু কথা কারুর কানে এলো না। খানিক পরে বেরিয়ে যাবার সময় রানী দত্তকে বলে গেলো। আশ্রমের নির্দেশ অমান্য করে ড্যাংগুলি খেলেছে তাই লল্তেকে একপায়ে দাঁড় করিয়ে মাথায় একটা ইঁট চাপিয়ে একঘণ্টা দাঁড় করাও।

কিষ্ট হাজরা এসে বিকেলে দেখলো লল্তের প্রচণ্ড জ্বর। পল্তে তার পাশে বসে আছে। ওবেলা লক্ষ্মী ময়রার দোকান থেকে পঞ্চাশ মুড়ি চেয়ে এনেছিল। ওদের গাঁয়ের নন্দদাদাকে বলে

দু'টাকা সাহায্য নিয়েছিল। সেটাতেই মুড়ি এনেছিল।

যেহেতু আশ্রমে সবার জন্য সমান খাবার তাই কেউ অন্যভাবে খাবার সংগ্রহ করতে পারবে না। তাই পলুতের হাত থেকে মুড়ি কেড়ে নিল জনপদ আশ্রমের মাদার।

পলুতে ভয়ে কিছু বলতে পারল না। যদি তার বাবা থাকত। যদি তার মা থাকত। আচ্ছা, মা কি এমন হয়। আচ্ছা, বাবা যাদের আছে মা যাদের আছে তাদের বোধ হয় এমন হয় না। পলুতের কান্না পাচ্ছিল। দাঁতে ঠোঁট চেপে ললুতের দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ললুতে যদি মরে যায়। একা কি করে থাকবে। দু'ভাই এক জায়গায় থাকবে বলেই তো পঞ্চাইত তাদেব দু'জনকে এরকম করে রেখে গেল। কিন্তু পঞ্চাইত খোঁজখবর করেনি কেন? পলুতে ভাবতে থাকে ললুতেকে কেমন করে বাঁচাবে।

কিষ্ট হাজরা দরজায় ঢুকেই বলে, 'অবেলায় শুয়ে কেনরে? উঠ।'

নিতাই বললো, 'ওর জ্বর, ওকে ওষুধ দেবে না?'

কিষ্ট হাজরা বললো, 'ওর বাপ তো টাকা রেখে গেছে—দাঁড়া, বিধান রায়কে ডেকেছি আসবে।'

নিতাই কথাটা বিশ্বাস করে যায়। পলুতে শুনে আস্তে আস্তে বলে, 'দাদা, তুই ভাল হয়ে যাবি।'

পলুতে বলে, 'বিধান রায় খুব ভাল ডাক্তার নয়?'

নিতাই বলে, 'কি জানি, রাম খাঁড়ার চেয়ে বড়?'

পলুতে বললো, 'শহরের ডাক্তাররা কি মরে গেছে?'

নিতাই বলে, 'ধুর মুখ্যু! কিষ্ট কাকা বলেছে শহরের ডাক্তাররা শুয়ারবাচ্চা। এরা অনেক টাকা নেয়। বাপ-মরা মা-মরা ছেলেদের দ্যাখে না।'

—'ওদের বুঝি বাপ-মা মরেনি?'

—'কি জানি!' উদাসীনভাবে বলে নিতাই।

পরের দিন কেটে গেল। পলুতে বললো, 'কই বিধান রায় এলো

না। লল্‌তের তো জ্বর পড়লো না, কিষ্ট কাকা।' কিষ্ট কাকা বিরক্ত হোল।

তখনো সন্ধ্যা হতে অনেক বাকী। ঘরের ভেতর হতে রানী দত্ত ডাকলো, 'কিষ্টদা তুমি নেবে না?'

কিষ্ট হাজরা আহ্লাদে গ'লে গিয়ে বললো, 'যা দেবে তাই নেব।'

রানী বললো—'ভেতরে এসো।'

কিষ্টকাকা যে চরম অবহেলা দেখাচ্ছে সে কথা বুঝতে পারে, মাদার-এর যে লল্‌তের দিকে নজর নেই তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বিধান রায় আসবে শুনে ওদের কেমন উৎসাহ হয়েছিল। বিধান রায় কে, কোথায় তিনি আছেন কি নেই, এ কথা তারা জানতো না—শুধু বিশ্বাস করেছিল বিধান রায় আসবেন। চরম অবহেলার মধ্যেও পল্‌তে নিতাইকে বললে, 'নিতাইদা, আমাদের তো কেউই নেই তাহলে রাম খাঁড়ার কাছে যাবো?'

নিতাই বললো, 'হ্যাঁ, তাই যা।'

সব কথা বলে ওষুধ আনলো রাম খাঁড়ার। মহান মানবিক মূল্যবোধ থেকে গ্রামজীবনে নিরলস কাজ করতো গ্রামের কোয়াক্ রাম খাঁড়া। তারাই বাঁচিয়েছিল গোটা গ্রামজীবন। গোটা সভ্যতা। লল্‌তে বিনা পয়সার চিকিৎসায় সেরে উঠল। বত্রিশটা ছেলের খাবারের দায়িত্ব নিয়েও বিলাস চক্রবর্তীর কোন দায়িত্ব ছিল না। মাদার কাজটাকে চাকরী মনে করছিল কিষ্ট হাজরা মনে করেছিল শুয়োরপাল বাঁচিয়ে রাখা। এরা প্রত্যেকেই মনে করতো জনপদ অনাথ আশ্রম তাদের জন্য একটি চারণভূমি। তার পদগুলি তাদের এই মফস্বল শহরের মানুষের কাছে যথেষ্ট মর্যাদা বহন করত।

বত্রিশজন ছেলের জন্য কেনা হোল লাউডাঁটা। কয়েকটা পেঁপে। কিলো তিনেক আলু। আলাদা কিছু খাবার যোগান দেওয়া হোল। আশ্রমের পাশের চা-গুমটি থেকে পাউরুটী করবার অপরাধে হারুকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল। অপদস্থ করা হোল নিতাই-গৌতম-লল্‌তে-পল্‌তেদেরও।

টাকার হিসাব নেই। বিলাস চক্রবর্তী টাকা চাইতে পারেনি

সরকারের কাছে। শহরের মানুষের কাছে নিতান্ত আবেদন পর্যন্ত করা হোলনা আশ্রম বাঁচাও। তাল বুঝে বিরোধীরা বলতে শুরু করল গাধার টুপি প'রে সরকারটা চলে। লাট-বেলাট উলটাবার জন্য বেশ বড়-সড় বক্তৃতা প্রচার করা হয় বটে, কিন্তু মানুষের প্রকৃত মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায় না। সরকারকে ধর্ষণ করে সরকারেরই লোকেরা।

নিতাই বললো, 'আমি আর আশ্রমে থাকবো না।' গৌতম বললো 'কোথায় যাবি ?' নিতাই বললো 'মার কাছে যাব।' লল্‌তে-পল্‌তের চোখ দিয়ে টুপ্‌ টুপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়লো। এত বড় পৃথিবী যার শেষ নেই, এত বড়। এত বড় পৃথিবী অথচ তাদের আত্মীয় বলে কেউ নেই। দু'দণ্ড জুড়াবার জন্য কেউই নেই। লল্‌তে-পল্‌তের মামা আছে কিনা তাও জানে না। কারুর সঙ্গে কোন যোগসূত্র নেই। তাদের যে গাঁয়ে ঘর ছিল, সে গাঁয়ের দু'চারজনকে জানতো। অন্য কাউকে চিনতো না। তাই তারা কোথায় যাবে! নিতাই চলে যাবে বলতেই তাদের চোখ ছল্‌ছল্‌ করছিল। সকালে উঠেই চেঁচাতে লাগলো, রান্নাঘরে বাড়তি দশ-বারোখানা রুটী ছিল। সকালেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তারই অন্তত ছ'-আটখানা পিস্‌। 'কৈ গেল' 'কে খেলো'। ভোরেই কিষ্ট হাজরাকে জানিয়ে দিল— 'খবরদার কিষ্টদা, আজ চলে যাবেন না, একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। আজ আমার একদিন কি ওদের একদিন।'

কিষ্ট হাজরা তার কানে কানে বললো—'চুপ করে যাও। গতকাল রাতে লল্‌তে আমাদের দেখে ফেলেছে।' ওসব কথায় কান দিল না রানী দত্ত। সে বললো, 'না, লল্‌তে নয়। নিতাই। নিতাই রুটী চুরি করেছে।'

তখনও রেডিওতে সংবাদ হয়নি। লল্‌তে গৌতমকে ফিস্‌-ফিস্‌ করে কী বলছিল। রাতে সে কোন ডিসটার্ব করেনি। নিতাই জেনেছিল ভোরবেলা।

মাদার রানী দত্তর গলা ঝন্‌ ঝন্‌ করল: 'নিতাই!' নিতাই আট-দশ বছরের ছেলে নয়। তার একটু বয়স বেশীই। চৌদ্দ-

পনেরো হবে। সুতরাং এদের চেয়ে সে একটু বেশী আন্দাজ করতে পারে। গায়ে ছিল একটা ফিনফিনে চাদর। অঘ্রান মাস সেইমাত্র ক'দিন হোল পড়েছে। আশ্রমের সামনেই ধানক্ষেত। ধান কাটার কাজে ব্যস্ত আছে চাষীরা। ওপাশে হাসপাতালের প্রাচীরের গাঁয়ে লেখা জ্বলজ্বল করছে 'আর্ত আর বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াও'। নিতাইয়ের আজ মনের অবস্থা 'যো হোগা, হোগা।' সে রানী দত্তের—সামনে এসে দাঁড়ালো। শক্তভাবে বললো, 'ডাকছেন?'

—'হ্যাঁ।' রানী দত্ত আরো শক্ত করে বললো। রানী দত্তর হাতে ছিল একটা পাতলা অথচ শক্ত বেত। 'রুটী চুরি করেছিস্ কেন রাক্ষস? বাপ্‌কে খেয়ে এসে এখানে আমাদের জ্বালাতে এসেছিস?' সপাং করে একটা শব্দ হোল। প্রায় আঁৎকে ককিয়ে উঠলো নিতাই। বাঘবাচ্চার মতো লাফিয়েই রানী দত্তর হাতের লাঠিটা কাড়িয়ে নিয়ে রানী দত্তর পাছায় কষিয়ে দিল বেতখানা সজোরে। শেষ বেতটা মারল রানী দত্তর ডান হাতের রিস্ট বরাবর। কাউচিয়ে-কাবিয়ে কেষ্ট হাজরা মাঠের চাষীদের জোটাবার আগেই নিতাই আশ্রমকে পেছন করে পালিয়ে গেল। তাকে কেউ ধরতে পারলো না। সে তার গাঁয়ের দিকে ছুটে পালিয়ে গেল।

রানী দত্ত চীৎকার করে কেঁদে কঁকিয়ে নিতাই-গৌতম-পল্‌তে-লল্‌তেকে দোষী করতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে হাতের রিস্টটা লাল হয়ে ফুলে গেল রানী দত্তর।

চাষীরা বুঝতে পারল না। কেষ্টদা থামাবার চেষ্টা করলো। বুকের পাটাওয়ালা একটা লোক লল্‌তেকে হিড় হিড় করে টেনে আনলো। 'কি ব্যাপার র‍্যা শালা ···মুরগীর পোঁদে তেল হইছে। শালারা বাপ-মাকে খেয়ে আশ্রমে শালারা ঝ্যামেলা পাকাচ্ছো।' লল্‌তে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। বললো, 'গতকাল রাতে আমরা দু'টো করে রুটী খেয়েছি। মাদার বলছে, রান্নাঘর থেকে রুটী চুরি করেছি।'

ধমক দিয়ে লোকটা বললো, 'আর কিছুছু নয়। এর জন্যেই হুলুস্থুল কাণ্ড।' প্রচণ্ড ধমক দিল। সব না বললে মেরে ফেলবে

বলে হুঙ্কার দিল। ললতে একেই ক'দিন জ্বরে ভুগেছিল—হুঙ্কারের ভয়ে শরীরের দুর্বলতায় সে মুতে ফেলল।

এঁ্যা এঁ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'কিষ্ট কাকা আর মাদার রাতে অসভ্য করছিল আমি দেখেছি বলে আমাকে দোষ দিচ্ছে। মাচ্চে। এঁ্যা এঁ্যা···

যারা এসেছিল তারা হাতের কাস্তে কাত করে ধরে একবার নাইটকাকু কিষ্ট হাজরা, অন্যবার মাদার রানী দত্তর দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকাতে থাকল।

পার্টি থেকে বহিষ্কারের তিন-চার মাস পরে এই প্রথম আজ যেন বড় একা-একা লাগছিল। যেন কঠিন নির্জনতা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে। ক'মাস ধরে তার ঘনিষ্ঠ কর্মীরা তাকে অন্যভাবে দ্যাখে। তার প্রতিনিয়তই মনে হচ্ছিল সে যেন তার স্বদেশেই প্রবাসী হয়ে আছে। কেউই তার সঙ্গে কথা বলছে না। কোন কাজে তার অংশগ্রহণ নেই। বিরাট এক কর্মকাণ্ড থেকে প্রায় কুড়ি বছর পরে যেন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মতন নির্জনতায় আছে সে।

তবুও প্রায় মধ্যবয়সী গউর বেশ জোয়ান প্রাণবন্ত উদ্যমী। ভেতরে ভেতরে নিঃসঙ্গ হলেও সে যেন শুনতে পায় কে বলছে: 'পাবে হে পাবে। নিশ্চয়ই পাবে। খুঁজতে থাকো। পাবে। আঘাত করতে থাকো দরজা খুলে যাবে। খুলবে খুলবে নিশ্চয়ই খুলবে। বিশ্বাস হারিও না। আঘাত করো। অস্থির হোয়ো না। স্থির হও। বিশ্বাসী হও।'

গউর চন্দর কোন কলঙ্কের দাগ নিয়ে পার্টি থেকে ফিরেনি। তোষামোদ, মেরুদণ্ড-বিক্রী আর অসভ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়েই তাকে চলে যেতে হয়েছে। সে চলেও এসেছে। কিন্তু সময়ের হাত ধরে কালের রাখাল যে বাঁশী বাজাতে বাজাতে সূর্য্যিকে উঠোন থেকে নামিয়ে দিয়েছে তার কি হবে।

বিড়ি ধরায় গউর চন্দর। বিড়িতে তার অদ্ভুত সম্মোহন। বিড়ি ধরালেই সে কেমন উদাসীন। প্রাণ চনমন্ করে। প্রাণবন্ত হয়। ডুবে যায় স্মৃতির জঙ্গলে। চক্‌চক্ করে কিছু অতীত।

হাঁটতে হাঁটতে বকুলগাছের গোড়ায় এসে গেছে সে। সিমেন্টের তৈরী সিংহমূর্তি দুটি বসানো আছে জোড়া বকুলের গোড়ায়। বহু পুরানো এই গাছ। এই গাছের গোড়ায় নাকি একদিন ব্রহ্মদত্যি

গভীর রাতে এক ব্রাহ্মণের মাথায় পা রেখে দুর্দান্ত যে নদী পার হয়েছিল। সামনেই সেই কুলকুল কলস্বরা-ক্ষীণস্বরা নদী রূপনারান। যেখানে দারকেশ্বর আর শিলাবতী মিলেছে, তার থেকে কিছু দূরে এই গউর চন্দর-এর বাড়ি।

অনেকদিন সে বকুলগাছের দিকে তাকায়নি। মাঝখানে যত কমই হোক অন্ততঃ কুড়িটা বছর। কুড়িটা বছর কেটে গেছে। আশেপাশে ঝোপ-জঙ্গল সরে গেছে। পাশে একটা মাচা। ছেলে-মেয়ে সবাই নিয়ে বসবার মাচা। ওপারে হুগলী, বিস্তীর্ণ মাঠ আর মাঠ।

বকুলগাছের দিকে তাকাতেই তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। সে তখন ইস্কুলে যায়। ষোল-সতেরো বছর বয়েস হবে ঠিকই। পাড়ার হরি জানা একটু মহাপ্রভুর ভক্ত। অবশ্য গাঁয়ের লোকেরা এই গাছের গোড়ায় তখনো মহাপ্রভুর ভোগ দিত পূজা দিত। এখনো দেয়। তাই সকাল-সন্ধ্যে ধূপ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

দৈনিক কারখানার কাজ সেরে হরি জানা সন্ধ্যাবেলায় ধূপ নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করতো বকুলতলায়। গউর আর তার এক সঙ্গী এ দৃশ্য প্রতিদিন দেখতো।

একদিন এরা দুজনে বেলাবেলি গাছের পাতার আড়ালে উঠে বসেছিল। সন্ধ্যায় হরি জানা ধূপ নিয়ে যখন গড় করছিল—গাছের আশেপাশে তখন কেউ ছিল না। শুধুমাত্র অন্ধকার আর সন্ধ্যার নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা।

পাতার আড়াল থেকে নাকী সুরে গউর চন্দর বলতে থাকলো, 'এঁ্যাই বেঁটা অঁত দূঁর থেঁকে পেঁন্নাম কঁরলে হঁবে নিঁ। কাঁছে এঁসে পেঁন্নাম কঁর।'

মুহূর্তের মধ্যে, হরি জানা বেঘোরে প্রাণ চলে যাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে দৈত্য কি দেবতা কি শয়তান না ভগবান কোন কিছুই আন্দাজ না করতে পেরে 'আঁ আঁ' শব্দে, ভীষণ অথচ বিকট, চীৎকার করে ছুটে পালিয়েছিল। আর সেই চীৎকারে দিগ্‌বিদিক্ কাঁপিয়ে ততোধিক ভয় পেয়ে গউর চন্দর আর তার সঙ্গীটি পালিয়ে বেঁচেছিল।

ঘটনাটা মনে পড়তেই গউর গাছের নির্দিষ্ট জায়গার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। তারপর হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে পুরানো বারো-তেরো বছরের সাইকেলটায় চেপে বসল।

ক'দিন ধরে খুঁজে খুঁজেও ব্লকের ইন্ড্রাসট্রিয়াল অফিসার ঋষিবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নেই। বি.ডি.ও. বা বি.ডি.ও. অফিসের কর্মকর্তারা কেউ বলতে পারছেন না তিনি কোথায়। কী করছেন। লোকটা দারুণ সুন্দর দেখতে। কিন্তু ট্যারা। একজোড়া সুন্দর গোঁফ। গলায় একটা কার বাঁধা। সম্ভবতঃ মাদুলী। তাঁর নাকি বুড়ী মা বর্তমান। তাঁকে নিয়েই হিমসিম। প্রচুর ছেলে তাকে খুঁজছে। ঋষিবাবুকে চাই। 'স্যার ঋষিবাবু?' 'রাক্ষস-খোক্ষসের কথা বলুন, ওর কথা বলবেন না।' ঋষিবাবু মৃদু হাসেন। আহা সুন্দর অমায়িক হাসি। বিষণ্ন হাসি নয়। বেশ অমায়িক।

ঋষিবাবুকে পাওয়া যেতেই অন্ততঃ জনদশেক ছেলেমেয়ে ছেঁকে ধরেছে 'স্যার স্যার'। আহ্লাদে আটখানা ঋষিবাবুর টেবিলে একটি বিপ্লবী সংগঠনের চাঁদার রসিদ কাঁচের নীচে সেঁটে রেখেছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় চাঁদার অংকটায় পৃথক সংখ্যা বসানো। গউর চন্দর এতক্ষণ কিছু বলেনি। এক এক করে সবাই চলে গেলো। মাত্র একটি মেয়েকে বসিয়ে রাখলেন : 'পরে হবে'।

গউর চন্দর ভাবলো, ঋষি তো হতেই পারে। মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই তো শরীর গলতে থাকে। ঋষিবাবুর তো গলবেই।

—'কী ব্যাপার বলুন। আপনি চুপচাপ আছেন কেন?' মামাতো ভাইয়ের চেয়েও কণ্ঠে আদর ছড়িয়ে ঋষিবাবু বললেন গউরকে।

—'স্যার একটা ইন্ড্রাসট্রি করবো। প্লিজ সাহায্য করুন।' আবেগমথিত কণ্ঠে গউর বলল।

—'আপনার কি কোন ধারণা আছে এ ব্যাপারে?' অফিসার জিগ্যেস করলেন।

—'না স্যার একটু-আধটু আছে। লোকজন নিয়ে করব। মূলতঃ

মার্কেটটা করব স্যার। সেসরুতে অ্যাপ্লাই করেচি। সাহায্য করতেই হবে।' গউর চন্দর বলল।

—'বসুন বসুন।' চেয়ার দেখিয়ে দিলেন ঋষিবাবু। মেয়েটি হাসলো। গউর চন্দর বসলো। অন্তরঙ্গ অনেক কথা হোল, আন্দোলন-সংগ্রাম-জীবন-বন্ধুত্ব-জীবিকা সব। ঋষিবাবুর এ ব্যাপারে অবশ্য বেশ দক্ষতা, হৃদতা করতে সময় লাগে না তার। একটা কথা গউর চন্দরের কানে লাগলো ঃ 'এতদিন জীবিকার কথা ভাবলেন না, বুড়ো বয়েসে আর কি করবেন, ফুচ্‌কা করুন। কোনো ঝ্যামেলা নেই। আপনাদের কি আক্কেল হে মশাই বয়েসটা ফুটিয়ে দিয়ে ব্যবসা করবেন! সমাজ পরিবর্তন হোল? কার হোল? সংসারের উপর দায় নেই আপনার? দায়িত্ব নেই? আর হবে? বয়েস তো নেই।'

মেয়েটি হাসলো। ঋষিবাবু হাসলেন। গউর চন্দর হাসতে পারল না। অতিকষ্টে সে যেন মুখ ভ্যাঙালো। ঋষিবাবু বললেন, 'অসম্ভব, বয়েস নেই অ্যালাউ করব কি করে?' কিছু বলার আগেই গউর চন্দরকে মেয়েটি বসে ইঙ্গিতে কিছু বলতে নিষেধ করল। মেয়েটি বলল, 'চলুন চা খাবেন যে। বাড়ি যাবেন না?' ঋষিবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই। আবার সেই চব্বিশ-পরগণা দেড়শো মাইল বাসে। উঃ।'

—'আগামীকাল আসবেন তো?' উদ্বেগে বললো গউর।

—'সিওর। চলুন,-উঠুন।'

চা-দোকানে ঢোকার আগে মেয়েটি কানে কানে বললো গউরকে, পাঁচশো লাগবে। হবে?

কান ঝন্ ঝন্ করছিল। কিন্তু বহিস্কৃত গউর চন্দর এর প্রতিবাদের ভাষা যেন হারিয়ে গেল।

কিন্তু টাকা কোথায় পাবে গউর। তার তো কিছুই নেই। বাপেরই বা কী আছে। মাঠে মজুর খাটে সে। মায়ের গায়ে রাংরত্তি নেই। পাঁচ-দশ বিঘে জমি নেই। বুড়ী গাই আছে, দুটো এঁড়ে আছে। আগে এঁড়েগুলোকে দিয়ে গাই দেখানো

হোত এখন আর তা হয়নি। বোনের কাছে সে যেতে পারবে না। ভাইদের সে বলতে পারবে না। কিন্তু ব্যবসাটা তো করতেই হবে। দু-একজনের কাছে গেলো যাদের সঙ্গে সে লড়াই করেছে। তারা সবাই ফিরিয়ে দিলো। তাহলে সাইকেলটা কি বন্ধক দেবে? না, ঘড়িটা বিক্রি করবে? সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কি করবে সে! একবার সে তার সঙ্গে দেখা করুক। বড় ইচ্ছে হোল তার। তনুর সঙ্গে দেখা করবে।

তনু একটি সমর্থিতপ্রাণ মেয়ে। গউরকে ভালবাসে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের তনু গউর চন্দরকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তনুর চাপেই সে এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তনু তাকে সাইকেল বা ঘড়ি কোনটাই খোয়াতে দিল না। কানের দুল-দুটো খুলে দিয়ে বলল, 'পরে সব ফিরে দিতে হবে।' হাসলো তনু। গউর চন্দর মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হোল।

নগেন্দ্রনাথ পাল জুনিয়র হাইস্কুলের হেডমাস্টার হরেরামবাবুর কাছে মাসে দশ টাকা সুদে তিন মাসের কড়ারে বারোশো টাকার জন্য দুল-দুটো বন্ধক দিলো গউর চন্দর। হরেরামবাবু একপয়সা সুদ কমাবে না। তিন মাসের মধ্যে মায় সুদে আদায় না দিলে জিনিস বিক্রি করে দেবে।

গউর চন্দর তার মুখের উপর কিছু বলতে পারে না। যে সরকারটার জন্যে সে রক্ত ঢেলেছে জীবনের অর্ধেকটা সময় ঢেলে দিয়েছে সেই সরকারটার উদ্দেশে গালাগালি দিতে থাকে; বলে, 'শুয়োরের বাচ্চারা সব শালা চাকুরেদের মাইনে বাড়িয়েছে টাকা খাটাবার জন্যে। শিক্ষক-কর্মচারীর অহেতুক বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরকারের উদ্দেশে থুঃ থুঃ ফেলে।' সে দেখতে পায় গ্রামে এক নতুন শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে তাদের সুবিধাবাদী সরকার। এরা জমিতে শোষণ করে। বেশী মাইনে পায়। মাইনের টাকায় চড়া সুদে দাদন করে। এরাই গ্রামাঞ্চলে অনেকেই নেতৃত্ব। এদের বিরুদ্ধে তাই প্রতিবাদ হয় না। কার্পেটের তলায় জমা হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ বিষাক্ত সাপ আর কীটের বংশধরেরা।

কথামতো টাকাও দিয়ে ফেলেছে গউর চন্দর। এফিডেভিট হ্যান ত্যান করে খরচও হয়েছে। ঋষিবাবুর মেয়েটি টাকাও সংগ্রহ করে এক কাপ চা খাইয়েছে তাকে। একস্‌চেঞ্জে যোগাযোগ করতে গিয়ে হদিস করতে পারেনি। এখানেও ট্যারা লোকের অভাব নেই। বেকারদের যিনি কাজ দিতে পারেন না। যার এককলম মুরোদ নেই সেই একস্‌চেঞ্জ অফিসারটির মুখ ভীষণ গোমড়া! আর কুৎসিৎ। লোকের সঙ্গে ভাল আচরণ করেনি। বেশী কথা বলতে রাজী নন তিনি। আহা! তিনি কত অমৃতবাণী দান করেন বেকারদের জন্য।

গউর চন্দর অফিসে সেই মেয়েটিকে দেখে বিহ্বল হোল। পাঁচশো টাকা নেওয়া মেয়েটি একস্‌চেঞ্জের কর্মচারী এবং ইন্ড্রাসটিয়াল অফিসারের সঙ্গে দালালি ঝুলাঝুলি করাই যার কাজ সেই মেয়েটিকে দেখে হাসলো

মেয়েটি তখন গাঙ উঁচিয়ে একজন এল·ডি.সি.'র সঙ্গে একই চেয়ারে বসে ছিল। আশ্চর্য! অফিসে প্রকাশ্যে মহিলা কর্মচারীর ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ্‌ চাপিয়ে বসে আছে বাহা. কি চমৎকার! গউর চন্দর বললো. 'দিদি'

—'কিছু বলছেন ?' মেয়েটি বললো

—'সেই ব্যাপারটায় একটু দেখতে হবে যে আপনি আছেন যখন।'

—'বড়বাবুর সাথে দেখা করুন।'

বড়বাবু নাকের উপর চশমা দিয়ে খবরের কাগজ দেখছেন। কাছে যেতেই শোনা গেল : 'ইংরাজী ছবি না দেখলে স্মার্টনেস বাড়ে না। বাংলা ছবি একটা··।' মন্তব্য বন্ধ হবার আগেই বিদ্যুৎ চলে গেল—'জ্যোতি গেল ·' বিদ্রূপে হৈ হৈ করছিল ক'জন।

বয়েস বাড়লে অভিজ্ঞতা বাড়ে। পরিচিতি বাড়ে। সুতরাং ভয় কি। গউর বললে. 'স্যার '

—'বাইরে বসুন। ডাকব।' প্রতাপ মঞ্চের হট কেকের মতো 'এ' মার্কা ছবিটার কথায় এলো।

একজন বললো, 'থানার সামনে দুটো ভিডিও পার্লার। সেখানে রাত্রি সাড়ে আটটায় 'ব্লু'র ফোয়ারা।'

বড়বাবু তড়াক করে উঠলো: 'তাই নাকি? সত্যি! ডি.সি. সি.আই., এস.ডি.ও. ওরা তো এসব নিষিদ্ধ করেছে।

এক কেরানী বললে, 'ওদের আন্ডারগ্রাউন্ড পারমিশনেই তো চলছে। মান্থলি আছে, মান্থলি।'

গউর চন্দর যতবার বলতে যাচ্ছে ঠিক ততবারই বড়বাবু পাত্তা দিচ্ছেন না। ওদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বললো, 'স্যার! ব্লু চলবে না কেন, কে পাত্তা দিচ্ছে? সব তো ঘুঘুর আড্ডা হয়ে গেছে। ওরা কিছুই করছে না। করবেও না। ব্যবস্থা যা আছে তাই থাকবে।'

বড়বাবু বললেন, 'তাই বটে। কিস্‌সু হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কি যে হবে।'

—'স্যার।' বিড়বিড় করে গউর চন্দর।

—'কি বলছ হে?'

—'একটা দরখাস্ত করেছিলুম।'

—'কত নম্বর ফাইল।'

—'স্যার! নম্বর আমার···।' আমতা আমতা করে পকেট থেকে নিয়ে বললো, 'এই নিন স্যার।'

—'আজ আর হবেনি। কাল আসুন।' হাই তুলে তুড়ি মারলেন বড়বাবু। একস্‌চেঞ্জ অফিসার ভীষণ ব্যস্ত। উনি কথা বলতে পারবেন না। তাই ওর যাওয়ার দরকার নেই। 'আপনার জন্ম তারিখ কত?'

—'মনে নেই, স্যার।'

—'সে কি! নিজের জন্মদিন মনে নেই?'

—'স্যার, নিজের জন্মদিন কেন মনে রাখি। একটু দয়া করে দেখে নিন স্যার।'

গউর চন্দর মনে মনে ভাবে, বাপ্‌রে, মহা পণ্ডিতের পাল্লায় পড়া গেছে। বয়েস তাঁর খুব বেশী নয়। সত্তর-একাত্তরের টোকাটুকির

পাশ করা মাল বলেই মনে হয়েছে বড়বাবুকে দেখে। সেই ঘুষ আমদানী নীতির ফসল ইনি। না বিদ্যে না গুণ। সরকারের ড্রেনেজ সিস্টেমের গলিত ফসল ছাড়া এরা আর কিছুই নয়। রাগ কিন্তু করবারই বা কি আছে। এখনই তোষামোদ ছাড়া উপায় নেই। আবার তো ফিরিয়ে দেবে।

হাফহাতা পরা প্রায় এক সমবয়সী লোক, সম্ভবতঃ পিয়ন মনে হচ্ছে তার, গউর চন্দরকে ডাকলো, 'ও মশায় শোনেন।'

দু'পাউড়ি এগিয়ে গেল গউর।

কানের কাছে মুখ রেখে সে বললে, আছে ?'

—'কি আছে ?' নিতান্ত ক্যাবলাকান্তের মতোই জিগ্যেস করল গউর।

—'মালকড়ি। বুঝতে পারছেননি উনি আটকেছেন। দিন একটু ছেড়ে দিন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।'

—'লোনটা পাব তো ?' গউর উদ্বেগের সঙ্গে বলে।

—'নিশ্চয়ই। ছাড়ুন ছাড়ুন।'

—'কতটা চাই ? বেশী নেই যে।'

—'যতটা আছে দিন না। শ'তিনেক নেই ?'

অন্য কোন চিন্তা না করে পকেট থেকে বের করে দিল টাকাগুলো। তারা অবশ্য দেওয়ালের অন্যত্র সরে গেছে। বড়বাবুর চোখের বাইরে। 'আরে ভাই ওটা কি আমাকে দিলেন ওসব বড়কর্তাদের সারিভাগ আছে। আমরা ফাইফরমাসের লোক আমরা ওদের মুখ। আমাদেরই দিয়েই ওরা পাপকার্য করবে। সব ওরাই নেবে। অথচ সতী সাজবে জানো হে। যেন কিছুই জানেনি।' যত্ন করে বার বার তিনবার গোনে নিল টাকাগুলো। 'এখানে দাঁড়ান আপনি ওকে দিয়ে আসি।'

আড়াল হয়েই পিয়ন বড়বাবুর ড্রয়ারটার ভেতরে হাত ঢোকালো। ফিস্‌ফাস করে কিসব কথা হোল। তারপর গউর চন্দরকে ডাকা হোল।

—'বসো হে গউর।' বড়বাবু বললেন। 'তাহলে তোমারটা

পাঠাতেই হবে। কি আর করবে হে—সামনের চুলগোছা তো পাকল। যেসব স্কীম দিয়েছো "ইঞ্জিনীয়ারীং' তা কি পারবে ?"

ঘাড় নাড়ল গউর। 'নিশ্চয়ই স্যার। বেশ বড় করে উদ্বোধন করব। আপনাকেও থাকতে হবে অনুষ্ঠানে। নিশ্চয়ই সফল হবো।' মনে মনে ভাবলো, দ্যাখো কি গাছ ঢেমনা দ্যাখো লোকটা। আগে একদম কথা বলছিল না। জুতার দাম কি দ্যাখো! তার ভেতর থেকে কে যেন বিদ্রূপ করে গউর চন্দরকে আঙুল উঁচিয়ে বললো, দেখলি শালা দ্যাখ্ দেশপ্রেম ক'টা টাকায় বিক্রী হয় দ্যাখ্। গউর চন্দর বললো, 'এক্সচেঞ্জে একটা কমিটি ছিল—এখন কি তার কাজ নেই।'

বড়বাবু বললো, 'নেই কেন। তারা আসা-যাওয়ার পার্টি। আয়েগা-যায়েগা। চা পিয়েগা। স্বজন-পোষণ বোঝেন? বৌ-ছেলে-সম্বন্ধীকে ঢোকানো ছাড়া তারা আর কি করে। এইতো ভট্চার্যি তার বৌ, বৌ-এর ভাই সম্বন্ধীকে ঢুকিয়ে কিছু ঘুষ-ঘাস খেয়ে—লে হালুয়া। তাড়িয়ে দিয়েছে। দেশটা গোল্লায় গেল। আরে মশায় সেই অবৈধ সম্পর্কের মেয়েটি আর তার সহযোগীর চাকরী হয়েছে। নাম যায়নি সুব্রতর। কেননা তখন পর্যন্ত সে চেঁচাতো। আর চাই, দেবো?'

চুপ করে গেল গউর চন্দর। কী সুন্দর বলছে। 'স্যার তাহলে কি হবে?'

—'কি আর হবে। যা করেছেন তাই হবে।' একটু জোর করে প্রায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'কাউকে কোন টাকাপয়সা দেননি তো? এখানে কেউ কেউ এইসব আজেবাজে প্রচার করে।' ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সে তেমন করেই উত্তর দিল, 'যতটা ছিল, দিয়েছি স্যার ততটাই। পরে হবে, স্যার।' ভাগ্যিস কেউ ছিল না।

পিয়ন তাড়াতাড়ি গউর চন্দরকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

একস্চেঞ্জ অফিসার টাকা খায় কিনা গউর চন্দর জানে না। তবে সারিভাগ আছে কিনা কে জানে। তাও সে জানে না।' বড়বাবু বললেন, আসুন পরে কথা হবে।

ক'দিন পরেই চিঠি পেয়ে বিডিও অফিসের ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে হাজির হোল। বোর্ডে সবাই থাকবেন। স্বয়ংবরা সভার মতো ব্যাংক রাজনীতির নেতা এবং নির্দিষ্ট সরকারী অফিসারের সামনে তাঁর লোন-প্রার্থীদের মঞ্জুরী দেবেন। অবশ্য প্রাথমিক। ব্যাংকগুলোর আসবার ইচ্ছাই নেই। কেননা সরকারের লোকেরা লোন দেবার জন্য যতটা আগ্রহ প্রকাশ করে ঠিক ততটা আদায় করতে চায়নি।

তাই লোন দিতে একদম আগ্রহী নয়। অথচ সরাসরি যদি 'না' বলে সব বাতিল করে তবে তো সবাই মিলেই এলাকায় পেটাবে তখন টাকার খস্ খস্ গুনতে গিয়ে শুধু কি প্রাণ হারাবে, তাই তারা অলিখিত ভাবে ঠিক করেছে ইন্টারভিউ-বোর্ডে কিছু বাতিল করবে, পরে ব্যাংকের নিজস্ব ইন্টারভিউয়ে বাতিল করবে কিছু। তারা যেগুলোকে মঞ্জুরী দেবে তাদেরকে নাকে দড়ি বেঁধে অন্ততঃ এক-দেড় বছর বিভিন্ন অজুহাতে ঘুরিয়ে কাগজপত্রের বাহানায় হ্যারাস করিয়ে বাতিল করবে। সবশেষে যারা এত অত্যাচারের পর দুর্যোধনের মামার মতো টিকে থাকবে তাদেরকে অর্ধেকের কম লোন দাদন করবে, আবার তারও একটা অংশ জমা থাকবে ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য। কেননা যা দাদন হবে তা তো আদায় হবে না কখনো।

এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে ব্যাংক তার অজুহাত তৈরী করে নিতে পেরেছে। উদ্যোগীরা জেনে ফেলে এসব। তাদের মধ্যে উদ্যম সেই অবস্থায় থাকে না তাই। গত ক'বছরে কাজকর্ম করতে গিয়ে গউর চন্দর এসব ব্যাপারে ব্যাংকের সঙ্গে কম ঝগড়া করেনি। যথেষ্ট উত্তেজক অবস্থা তৈরীও হয়েছিল সে-সময়। ব্যাংক-ম্যানেজার বিধুবাবুর গউর চন্দরের উপর বিতৃষ্ণাও নেহাৎ কম নয়। পরস্পরের মধ্যে চোখ-রাঙানিও কম হয়নি। তিনি জানেন গউর চন্দরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সহানুভূতি থাকলেও কম রাগ তাঁর ছিল না। এই ভাবনার সময়েই গউর চন্দরের ডাক পড়লো।

যাদের হাতে ছেড়ে দেবার তালিকা ছিল তারা দেখল গউর চন্দর

নেই সেই তালিকায়। তাদের মুখে সুপারির কুচো। মুহূর্তে জগন্নাথ চা দিতে এলো। যেন গউর চন্দরের জন্যই অপেক্ষা করছিল। গউর চন্দরকে বললো জগন্নাথ. 'দিন না ভাই চা-গুলো ধরে।' হাতাহাতি পেঁাছে দিতে সাহায্য করল সে।

এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি করবেন ?—এত বয়েস হোল।'

—'করব আর কি, ব্যবসা করব।'

ডি.আই.সি. জেনারেল ম্যানেজার বললেন. 'অভিজ্ঞতা আছে ?'

—'ইয়েস, স্যার।'

—'কিন্তু ওর তো বিরাট স্কীম হবে কি করে। আপনার নিজস্ব টাকা আছে ? কতটা দাদন করতে পারবেন ?' ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বললো।

—'কিছুই নেই। তবে চেষ্টা করব।' গউর উত্তর দিল

একস্‌চেঞ্জ অফিসার বললেন, 'আপনার বয়েস কত ?'

—'প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, স্যার।' গউর চন্দর বললো

অফিসার বললেন. 'স্যার, চল্লিশ বছর তিনমাস সতেরো দিন এর বয়েস। একে দেওয়া যাবে না এই প্রকল্প। বয়েস পারমিট করছে না।'

গউর চন্দর কী শুনছিল তা যেন নিজেও জানে না। সে অবিশ্বাস করছিল নিজেকে। এতক্ষণ পর্যন্ত যে আশা তার বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিল সেই আশাটুকু যেন বেরিয়ে পড়বার জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগল !

সভাপতি জেনারেল ম্যানেজারকে কি-একটা ইঙ্গিত করলেন।

তিনি বললেন, 'বয়স না পারমিট করায় গউর চন্দরের স্কীমটি বাতিল করা হোল। আপনি আসুন।'

কোন কথা বলতে পারল না গউর চন্দর। ফেলে আসা বছর-গুলোর যে তেজ যে উদ্দীপনা তার প্রাণে মনে সঞ্জীবিত ছিল তা এক মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তার পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীরাও তাকে যেন ব্যঙ্গ করে ভেংচি কাটছিল।

কোন রা কাটতে পারল না। কোন অনুরোধ করতে তিলমাত্র ইচ্ছে হোল না তার। ঘাড় নীচু করে, ঘরের পর্দা সরিয়ে বাইরে বের হবার সময় দেখল অন্ততঃ সত্তর-পঁচাত্তরটি উৎসুক মুখ: কি হয় কি হয়। সে যেন একা অনাত্মীয় পৃথিবীর নির্লিপ্ত উত্তরাধিকার। চৌকাঠে পা দেবার সময় কে একজন মন্তব্য করল: 'নাচো হে গউর চন্দর, ধেই ধেই করে নাচো।'

খুব ধীরে অথচ শান্তভাবে এক আশ্চর্য উদাসীনতায় খুব একা আর একাকিত্বের নির্জনতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলো। অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে চেয়ে তার চোখ-দুটি থেকে টুপ্ টুপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। চতুর্দিকে···প্রতিধ্বনিত হতে থাকল: 'নাচো হে গউর চন্দর, ধেই ধেই করে নাচো।'

ঘর ঢুকতেই ভক্ ভক্ করে গন্ধ ছড়ালো। রাগে গর্ গর্ করছিল গব্রা। পা একটু টলছিল। হাত-পায়ে ধুলো-বালি তো আছেই। ডান হাতের কনুইটাতে একটু ছাড়ে গেছে মনে হচ্ছিল রেবতীর। মদ খেলেই রেবতীর গব্রাকে ভয় করে। কখন কোন্ মুহূর্তে চাপ্টে মারবে—তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল। কিন্তু কি করে চুপ করে থাকবে। মহা মুস্কিল তো। সংসারে কেমন অঘটন ঘটল নাকি, কোন 'মুখপোড়া' 'ওলাউঠো'র পাল্লায় প'ড়ে কারও কোন সর্বনাশ করেছে কিনা কে জানে। বড় জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ভয় হচ্ছিল রেবতীর।

গব্রা একটু যেন হোঁস্‌ফোঁস্ করছিল। একটু ক্লান্তির ছাপ। চোখে মুখে একটা প্রতিশোধের আগুন ব'লে মনে হোল।

গব্রার মুখে একটা কাটা দাগ আছে। সে অনেক দিন। সেই সত্তর-বাহাত্তর সালের সময় মহান দেশনেতাদের পাল্লায় পড়ে তার গালাচিটা ফালিফালি হয়ে গেছিল। সে এক আশ্চর্য সময়। অদ্ভুত অভিজ্ঞতার জীবন। এসব রেবতী জেনেছে। বুঝেছে। মুখে বসন্তের দাগ, ফালি হওয়া গালাচি চেরার দাগ, শরীর প্রায় অংশের কাটাকুটির দাগ সহ কালো কুচ্ছিরি এই মানুষটার কোলে ঘুমিয়ে যেতে রেবতীকে ভীষণ ভাল লাগে। সে মদ খায়, গালাগালি করে তবুও গব্রার গলা জড়িয়ে রেবতী আদর করে আদর খায়। এক আশ্চর্য ভুবন গড়েছে রেবতী।

—'তুমি অমন করে হাঁপাচ্ছো কেন? কি-সব হইচে নাকি? তোমার রিক্‌সো কোথা? কি হই'ছে। উৎকণ্ঠায় আবেগে রেবতী ভয়ে-ভয়েই জিগ্যেস করে। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে।

—'ধুর 'মাগি চুপ কর দিকি। ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করচু কেনে।'

গব্‌রা বিরক্তিতে বলে ওঠে। তার জিভের উচ্চারণে সম্পূর্ণ জড়তা জড়িয়ে ছিল।

ফের জিগ্যেস করল রেবতী। কি হইচে বল না। গম্ভীর গলায় বলল গব্‌রা—'কি আর হবে। ওদের অটো-রিক্‌সা ভেঙে খালে ফেলে দিয়েছি আমরা। আর তার মালিককে পিটেছি খুব। কতকগুলো লোক ওকে ট্রলিতে করে হাসপাতাল গেছে। বলেছি থানা-পুলিশ হোলে তোদের বাপ-চোদ্দপুরুষের নাম লুকি দুব।'

—'কে কে ছিলে তোমরা?' রেবতী আরো উদ্বেগের স্বরে বলে।

—'কেন আমরা সাইত্রিশজন ছিলুম। দু'একটা প্যাসেঞ্জারও মার খেইছে।' গব্‌রা বলে। গব্‌রার ঘোরটা কাটছে মনে হোল।

—'তাহলে কি হবে?' আবার সেই পুলিশ-কেস-ঘরছাড়া-খুন-মারপিট। হায় হায় করে উঠল রেবতী। রেবতী জানে না শুনেছে গোব্‌রার কাছ থেকে। সেই ভাঙার দিনের কথা। গব্‌রা বিয়ে করবার পর একসময় গল্প করতে করতে বলেছে তার হাওড়ার কদমতলার অভিজ্ঞতার কথা।

রাত তখন নিশুতি। বারোটা তো হবেই। কদমতলার ভ্যান-রিক্‌সো স্ট্যান্ডে গাড়ি লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল গব্‌রা আর অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশজন বিভিন্ন বয়েসের ছেলেরা। তখন গব্‌রার বয়েস বাইশ-তেইশ হবে। সবাই নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। বিশেষতঃ গব্‌রার এই জন্মে তো কেউ কোথাও নেই। তার মা কে সে জানেনি। তার বাপকে এ জন্মে দেখেনি। তার কে যে বাবা কিংবা কে যে মা আজও গব্‌রা জানেনি। অথচ কেমন করে সে এত বড় হয়েছে তাও তার মনে নেই। চা-দোকান, মিষ্টি-দোকানদারের চাকর-খাটা কত কি করে একটা ভ্যান করেছিল সে। অবশ্য ভ্যানটাও প্রকৃত অর্থে নিজের নয়। একজন মালিকের। প্রতিদিনের ভাড়ায় চলতো গাড়িটা। প্রত্যেক দিন ছ'টাকা। বাকী সমস্ত খরচপত্র সব তার নিজের। মালিক টায়ার টিউব বদলে দিত। দৈনিকের ভাড়া মিটিয়ে যা থাকতো তা তার নিজের। একদম

নিজের। একার। সেই টাকায় মদ খেতো। সিনেমা দেখতো। ভাত খেতো। ফিস্টি করতো। গুন্ডামি-বদমায়েসি-জুয়াখেলায় গবুরার যোগ্যতায় খরচা হোত। দিয়ে-থুয়ে হাতে থাকত সাত টাকা।

কিছু-না-কিছু ঘটনা প্রত্যেক দিনই ঘটতো। কিন্তু এমন ঘটনা কিছু ঘটে যে-ঘটনা একদিন দু'দিন না—সারাজীবনের স্মৃতিতে রূপান্তর হয়ে যায়। সেরকম রাতটাও ছিল এক অনিবার্যতার রাত। রাত্রি তখন নিশুতি। গরম কাল। বোশেখ-জোষ্টি মাসের গরম। রিক্সো স্ট্যান্ডের ভ্যানগাড়ির উপরই অন্ততঃ পনেরো-কুড়িজন রিক্সো ভ্যান-চালক ঘুমোচ্ছিল। সেই গভীর নিশুতি রাতে তাদের কাছে কেউ ছিল না। ঘিয়ে-ভাজা নেড়ীকুত্তারাও মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে গেছিলো। দূরে মিষ্টি-দোকানগুলোয় তখনো ভিয়ানের কাজ চলছিল মাত্র। কদমতলার উঁচু বাড়িগুলোর ভিতরের আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এখানটায়ও ছিল একটা টিউব-লাইট। পাশের টিউবগুলোতে কোনরকমের আলো ছিল না।

হঠাৎ একটা কালো গাড়ি এসে ঢুকেছিল। ঠিক তারা যেখানটায় ঘুমোচ্ছিল সেখানটায় থেমে গেল। গাড়ি থেকে নেমে এলো ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক-দোস্ত নেড়া নামে পরিচিত নেড়ুদা। এর বেশী আর কেউ তাকে জানে না। তিনি অতি ব্যস্ত অতি ধড়িবাজ এবং যে-কোন অতি বাস্তব ঘটনার নেপথ্য নেতৃত্ব। তিনি এবং তাঁর দু'তিনজন লোক গাড়ি থেকে নেমেই ঠেলা দিয়ে ডাকতে লাগলো : 'উঠ্—এ্যাই উঠ্।' এই শালা চামচা, এই শালা খচা, মোধা, এরকম ডাকনামে পরিচিত লোকদের ডেকে-ডেকে ঠেলা দিয়ে দ্রুত ঘুম থেকে জাগালো। নেড়ুদা এদের বিভিন্ন সময়ই বিভিন্ন কাজে এক-একটা অংশকে ব্যবহার করতো। সবাইকে একই অ্যাক্শনে ব্যবহার করতো না। সবাই সমাজবিরোধী কিন্তু ভিন্ন কাজে ভিন্ন জন। ফলে সহজেই গোপনীয়তা রাখা করতো। আইনের ভীতি তাদের মুখ চেপে রাখতো। কবেই তাদের বিবেক বিক্রি হয়ে গেছিলো কেউ খোঁজ রাখেনি।

একজন বললো, 'গুরু, কোথা যেতে হবে ?'

নেড়ুদা বললো, 'হাওড়া হাসপাতালে যেতে হবে। চল চল' মস্ত ব্যস্ত, সে বললো ; 'একশো-কুড়ি টাকা করে পাবি।'

—'কী ব্যাপার বলো না।' একজন বললো।

—'কী আর বলবো ? চল্—উঠ্।' ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কালো ভ্যানে চেপে বসল সবাই। কেউই আন্দাজ করতে পারলো না। হাসপাতালের ইমারজেন্সীতে ঢুকিয়ে দিয়ে চারদিকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোল এবং গেটে গেটে মোতায়েন করা হোল বিশেষ শক্তিমান লোক।

নেড়ুদা বললো, 'তোরা একশো-কুড়ি টাকা করে পাবি। এখনই পাবি। আগে অপারেশনটা হয়ে যাক।'

কী অপারেশন কেন অপারেশন। কিছুই বুঝতে পারছে না কেউ। অশ্চর্য ব্যাপার। পরপর মুখ-চাওয়া-চাওই করছে। গব্‌রা বললো 'কী ব্যাপার খুলে বলো ?'

নেড়ুদা বললো, 'কী আবার ব্যাপার। লাসবন্দী করা হচ্ছে তোমরা কি জানো না ? সরকার বলেছে সব নির্বীজ করতে হবে। নাহলে ভেড়ার পালের মতো বাচ্চা জন্মালে দেশের তো ভীষণ বিপদ। তোরা রিক্‌সা টানছিস তোদের বেটারাও টানবে। তার চেয়ে লাস-বন্দী হোলে ছেলেপুলে নেই খাও-দাও ফুর্তি করো প্রেম্‌সে নাচো। আজ এ-মেয়ে কাল ও-মেয়ে কোন ব্যাপার নেই। যাকে খুশী যার কাছে ইচ্ছে। কারও বিপদ নেই। আমরা নির্বীজ করছি যাতে কোন বিবাহিতা-অবিবাহিতা-বিধবাদের কোন বিপদ না আসে।' গব্‌রা হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো: নেড়ুদা তুমি আমাকে বাঁচাও।' আমি তো এখনো বিয়েই করিনি, বাঁচাও—আমার যে ছেলের দরকার। আমার যে কেউ নেই।'

নেড়ুদা বললো, 'কেলানী! বিদ্যে তো কিছুই নেই। এসব কিছু বুঝবি না। যা হচ্ছে হতে দে। বাধা দিবি না। একদম কেলিয়ে দোব।' মুহূর্তের মধ্যে মনে হয়েছিল এ নেড়ুদা নয়, এ রাক্ষস। এক শয়তানের পাল্লায় পড়েছে তারা। সে যেন তাদের গোটা গিলে খেতে আসছিল ভয়ঙ্কর ক্রোধে। ভয় পেলো তারা।

সে-রাতে সেই কুড়ি-বাইশজন ভ্যান-চালকের স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করে যখন বাড়ি ফিরেছিল রাত তখন ভোররাতের দিকে গড়িয়ে গেছে। একশো-কুড়ি টাকা নয়, প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল পঞ্চাশ টাকার একটা নোট। বাকী টাকা নেড়ুদা, ডাক্তার ও অন্যান্যদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়েছিল।

কিন্তু যেদিন শোনা গেল মৃত্যুখনির গ্রামগুলিতে রাস্তা ঘাট তৈরী হচ্ছে—নতুন করে নির্মাণ হচ্ছে বাঁধ-নালা, খালগুলি কাটা হচ্ছে, নিকাশীগুলো খোঁড়া হচ্ছে, জমিতে সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে: গ্রামের নিঃস্ব অসহায় চাষীরা খাস পাট্টা পাচ্ছে, ভাগচাষীর রেকর্ড হচ্ছে, গ্রামের গরীবরা আই.আর-ডি.পি. পাচ্ছে।' বাঁচবার সাহস পাচ্ছে বিধবারা, সেদিন গব্‌রা ভেবেছিল, আর নয়—একবার গাঁয়ের দিকে যাওয়া যাক। সে তার নিজের গাঁ জানে না। নিজের বলতে কেউ নেই। বাপ-মায়ের পরিচয়হীন গব্‌রা কোন্ গাঁয়ে কোথায় যাবে তা সে নিজেই জানতো না। এতদিন শহরে থেকে সে তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি, অন্ততঃ গাঁয়ে গিয়ে যদি সে ঘর বাঁধতে পারে। একটা স্বপ্ন দ্যাখে সে। আপাততঃ সব-চাওয়া ফেলে রেখে একদিন গাঁয়ে চলে আসে। মেদিনীপুরের বানভাসি শহরের কাছাকাছি একটা গাঁয়ে। একটা দূর সম্পর্ক থেকেই সে কমলের বোনকে বিয়ে করে। কমলের বোন রেবতী। আঁতুড়ের রেবতীও ছিল বাপ-মরা। তার বাপ মরে যাবার পর অন্য লোকের কাছে শুতো তার মা লগী। লগী বলেই তাকে সবাই ডাকতো। যে ডাকতো তার কাছেই যেতো। কোন নিয়ম ছিলনি কোন বারণ ছিলনি। 'ধুর ধুর নিয়ম-টিয়ম নেই। ছাড়ো।'

রেবতী মেয়েটি বড় ভাল মেয়ে। লগীর ঠিক উলটো। স্বামী-সোহাগী যাকে বলে রেবতীও তাই। বড় মমতায় সে লালন করছে গব্‌রাকে। শহর ছেড়ে এসেছে গব্‌রা কিন্তু ভাকু ছেড়ে আসতে পারেনি। আর এই ভাকুর বিভিন্ন ব্যবসায় বিভিন্ন নাম। কোথাও ডাব, কোথাও শান্তিজল, কোথাও থামস্ আপ, খড়গুজো, গলা-সরু,

তেল, ভুজংং কত কি। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতোই। এক কথায় গব্‌রা ভাকু-ভক্ত।

রেবতী আগে বিরক্ত হোত, এখন আর হয়নি। বন্যার পর প্রায় বারো-তেরো বছর কেটে গেছে। তাদের কোন ছেলেপুলেও হয়নি। রেবতী কাঁদে। গব্‌রাও কাঁদে। ছাতিতে একটা যন্ত্রণা হয় কষ্ট হয়।

এতদিন তাদের কোন ঘর ছিল না—শ্মশানের ধারে রাস্তার ধারে পঞ্চায়েতবাবু আর পাড়ার লোকদের সাহায্য নিয়ে গব্‌রা ঘর করেছে। একটা ভাল ঘর। শহরে থেকে দূরে অনেকসময়ই চাকুরেরা যেমন কষ্টেসৃষ্টে একটা মাটির ঘর যোগাড় করে, ঠিক তেমন একটা ঘর বানিয়েছে সে। সেই ঘরেই তাদের জীবনটা কেটে যাবে।

কখনো ভাবতে পারেনি সে ঘর করবে। ঘরে বউ থাকবে। একটা আশ্চর্যই লাগে তাকে। এই ঘরের জন্য পঞ্চায়েত থেকে টাকা দেয়নি। কিন্তু তাকে অন্যভাবে সহযোগিতা করেছে সবাই। আসলে সে এখনও স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারেনি তাই তাকে স্থায়ী সহযোগিতা করা যায়নি। এটা নিয়মের মধ্যেই।

ইতিমধ্যে গব্‌রা এখানে কৃষক-সমিতির সক্রিয় লোক। তার কয়েকজন ভক্ত হয়ে গেছে। বেশ ভালই আছে গব্‌রা। কখনো মাটি-কাটার কাজ করে। কখনো রিক্‌সা টানে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে তার শাশুড়ী লগী ঐ রিক্‌সা দিয়েছিল। এই গ্রাম থেকে বানভাসি মহকুমা শহরটির মাত্র তিন-চার কিলোমিটার দূরত্ব। পঞ্চায়েতের আমলেই রাস্তাটি মোরাম হয়েছে। বেশ চওড়া রাস্তা। এক-দেড়শো বছরের রাস্তা। পুরানো কর্তারা এই গ্রামগুলোকে সত্যিকারের অন্ধকূপের মতো মৃত্যুখনি করে দিয়েছিল। এখন সেই খনি শবাধার না হয়ে ফুলাধারে রূপান্তর হয়েছে। কিন্তু গ্রামের নামটা তো চেঞ্জ করা যায়নি। তাই মৃত্যুখনি থেকে বানভাসি শহরে রিক্‌সা টানছিল ওরা।

প্রচুর ব্যস্ত রাস্তা। এই রাস্তা পিচ্‌ করবার ব্যবস্থা না করে

তিনটে মানুষ আর আড়াইটা ট্রলি যাবার জন্যে, মেদনীপুরের ডি. এম. তার মামা-শ্বশুরের রাস্তাটি পাকা করে দিয়েছে। আশ্চর্য জমিদারী ব্যবস্থা। যে-ই শুনেছে পান্নার রাস্তা পাকা হচ্ছে অথচ মৃত্যুখানির রাস্তা কুঠিঘাট বা পালপুকুরে নজর নেই। তখন ডি· এম -এর আদ্য শ্রাদ্ধ করে রাজনৈতিক হাদা-হুদোদের বাপ-বাপান্ত করছে সবাই।

গব্‌রা বলে, 'শুয়োরবাচ্চারা মানুষ কি? যে তাদের জ্ঞান থাকবে।' গব্‌রার কথায় রাগ করে অনেকেই। পাল্টা উত্তর দিয়ে নেতারা শীতল হাত বুলায়ঃ 'ভাই, সীমাবদ্ধতার মধ্যে চলি, তাই সব্‌বার মন জোগাতে হয়।'

গব্‌রা বলে, 'এখনো সীমাবদ্ধতা? না, সীমাবদ্ধতার নামে অসভ্যতা: এই সীমাবদ্ধতা কেন হে? ডি· এম· যেন বাপের সম্পত্তি পেইচে। একবার প্যাঁদালেই সব শালা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা নেতারা যদি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ো তবে ডি· এম· বাবু তোমাদের মানবে কেন? মুখে নুড়ো জেবলে দিবে তো বটেই।' বেশী বলতে ভয়ও হয়, তবুও খচ্‌ খচ্‌ করে বলে ফেলে। কিন্তু যতই হোক গব্‌রা রিক্‌সাওলা, কে ওকে গুরুত্ব দেবে।

রেবতীর আই·আর·ডি·পি·'র গাইটা গোয়ালে 'বাঁ বাঁ' করে ডাকে। গোয়াল থেকে বের করা হয়নি। মুখে এক আঁটি খড় দিতে হবে। তাই ব্যস্ত হয়েই উদ্বেগে গব্‌রাকে বলে, 'তাহলে কি হবে।'

গব্‌রা রাগে গর্‌ গর্‌ করতে বলে, 'কী আর হবে। আমরা শালা রিক্‌সা চালিয়ে খাই—আমাদের ঘর-সংসার চলে রিক্‌সার টাকায়। আর কিনা আমাদের রিক্‌সার পরিবর্তে মৃত্যুখনিতে অটো-রিক্‌সা ছ'খানা দিল। শিক্ষিত বেকার-এর নাম করে ব্যবসায়ীরা তাদের টাকা খাটিয়ে আমাদের সর্বনাশ করছে। আমরা পার্টিকে বলেছি। পঞ্চায়েতে বলেছি। কেউই কোনদিকে নজর দেয়নি। ওদের থেকে ওরা টাকা পায় চাঁদা পায় তাই ওদের কথা শুনে। কিন্তু আমরাও তো মিছিল করি। ভোট দিই। সরকারকে বাঁচাই। আমাদের কথা ওরা বা শুনবেনি কেন? যদি ওদের

রিক্সায় নিয়মমাফিক লোক আসতো তাতে বলার ছিল না, কিন্তু ওরা নিয়ম না মেনে বারো-চোদ্দজন লোক নিয়ে যাতায়াত করছে। ভীষণ বিপদে পড়েছি আমরা। একটাও লোক পাচ্ছি না। এ-ওর কোলে চেপে অটোয় যাচ্ছে। ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী চাপাচাপি টেপাটেপি করে যাচ্ছে। তার বেলায় কেউ দেখছেনি। তাই আমরাই বা মানবো কেন? যা হবে-হবে। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দুবো।'

মস্ত বেকার হয়ে পড়বার আশঙ্কায় চোখ মুখ ঢুকে যায় তাদের। প্রায় দেড়-দু'বছর ধরে এই সমস্যার সমাধান কেউই করছে না। তাই নিজেরাই আইন তারা ভাঙছে। কেউ শাস্তি দিতে এলে প্রতিশোধ নেবে।

রিক্সার রাগের কথা পুলিশও জানে। নেতা জানে। প্রশাসন জানে। তবু এদের সমাধান হয়নি কেন। বুঝতে পারেনি। রিক্সার লোকেরা মিছিল করে। রেবতীও মিছিল করে। কিন্তু কেউই এদের কথা শোনেনি।

গবুরা যাকে ফাটিয়েছে (না—গবুরা একা নয়, ওরা সবাই), সে একটু আশঙ্কাজনক অবস্থায় গেছে হাসপাতাল।

রেবতী জিগ্যেস করে, 'কিছু হবে না তো?'

'কি হবে। যা তুই পালা।' গবুরা বেরিয়ে যায়।

রেবতী শ্মশানের দিকে মুখ করে কত কি ভাবতে থাকে। তাদের ছেলেপুলে কেউ নেই। একা স্বামী-স্ত্রীতে শ্মশানের ধারে থাকে। কত ভয় কত বিপদ কত কি। রেবতী গোয়ালে যায়, গরুর খুঁটা থেকে গাই বের করে টানতে থাকে। নিজের মনেই বকে: 'বোনমেগোরা গাই দিল পুয়াতি হয়নি। ওলাউঠাদের সর্বনাশ হবে।'

সে গাইটাকে টানতে টানতে মাঠে নিয়ে যেতে লাগল। পঞ্চায়েতের কোন দোষ ছিল না। রেবতী এখানের স্থায়ী বাসিন্দা বলে তাকে একটা গাই দেওয়া হয়েছিল আই. আর. ডি. পি. প্রকল্পে। বানভাসি শহরের লাইভষ্টক অফিসারের যোগাযোগে মেদিনীপুর জেলা কর্তৃপক্ষ থেকে প্রতিটি তিন হাজার টাকার মূল্যের যে কুড়িটি

গাই দিয়ে গিয়েছিল সেগুলি বড় জোর ইয়াসিন চাচা বেঁচে থাকলে ছ'টাকা কিলো দরে কিনতো, তাতে অবশ্য হাড় বা ভুঁড়ি ধরা হোত না। অন্ধের ক্রস-ব্রীড-এর নাম করে হাজার হাজার টাকা জেলা লাইভস্টক অফিসারের। চুরি-চামারি করে রেবতীর মতো মেয়েদের গো-ঠকান ঠকালো। আপত্তি করেছিল পঞ্চায়েতবাবুরা কিন্তু লাইভস্টক অফিসারেরা এমন তড়পানি আর অসভ্যতা করেছিল যে তখন সই করতে বাধ্য হয়েছিল প্রধান। রেবতীদের নেবার মতো ছিল না। গরুগুলি দেখেই তো পছন্দ হয়নি। দুধ দেওয়া তো পরেব কথা।

ঘটনাও তাই তাদের পুয়াটাক দুধেল গাই আর গাভীন হয়নি। বানভাসি মহকুমা শহরের পশুচিকিৎসার ডাক্তার গরু দেখতে এলে একশো পঁচিশ টাকা ভিজিট নিচ্ছিল। হাসপাতালের সরকারি ওষুধ ইনজেক্‌শন দিত আর টাকা নিত। বিরুদ্ধে তার অভিযোগ করবার পর সে আর কোন উৎসাহই দেখায়নি। ফলে গাইয়ের বাঁট শুকনো। দুধ নেই। খড়-কুঁড়োর খরচ, ওষুধ খরচ বাড়ে। ঋণ শোধ করবার তাগিদ আসে ব্যাংক থেকে। ঘাঁট-বাটি বন্ধক দিয়ে দু'চার কিস্তী দেবার পর আর টাকা দিতে পারেনি সে। একসঙ্গে বিশটা গাই দিয়ে সরকারী পোষা অফিসারেরা হাজার হাজার টাকা লুটে লে লুটে-লে করে টাকা নিযে চলে গেল। আর রেবতীরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোল তার সমাধান আর হোল না। ব্যাংকের টাকা অনাদায়ী হোল। রেবতীরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোল। বিশেষতঃ রিক্‌সার টাকা ঢুকতে লাগলো গরুর পেটে। অবশেষে রিক্‌সা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছাউনীর খড়ের চালে টান দিয়েছিল গাইটি। অথচ এমনটি হবার কথা ছিল না। দু'একজন কর্‌ত্তা ডেকে দামও হয়েছিল ; তারা বলেছিল, 'দুশো টাকা দিলে নিতে পারি দু'শো টাকার একপয়সা বেশী দিতে রাজী হয়নি। তাছাড়া ব্যাংক বলেছে তাদের ঋণ না মিটলে গরু বিক্রি করা চলবে না। মাত্র দু'শো টাকায় বিক্রি করতে হবে তিন হাজার টাকার গরু। এটা কি খবর, না বজ্রাঘাত! এই বিপন্নতার ভিতরে রিক্‌সর গণ্ডগোলে

গব্‌রাকে জড়িয়ে পড়তে দেখে রেবতী ভয় পায়। আতঙ্কে ভেতর শুকিয়ে গেল তার।

পঞ্চায়েত বলেছে তাদের টাকা নেই তাই কাজ করাতে পারছে না। পুরানো যে কাজ হয়েছিল সে কাজেরও টাকা দিতে পারেনি। গব্‌রা সেখান থেকে বেশ কিছু টাকা পাবে। কিন্তু পাচ্ছে কই। সমস্যাটা গব্‌রা রেবতীদের কাছে সংকট তৈরী করে দিয়েছে। এই সংকট থেকে উঠবার চেষ্টাও সে কম করেনি। কিন্তু কিছুতেই তো পেরে উঠছে না। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। শীতে একটা চাদর কিনে দিতে পারেনি গব্‌রা। আয় বাড়ছে না তেমন করে। গব্‌রাও ভেবেছে অনেক শহরে আবার ফিরে যাবে নাকি। কিন্তু সে সমাজটাও ভাল নয়। সেখানে থেকেই বা লাভ কি। সেখানে গেলে মানুষ হবে অমানুষ, অমানুষ হবে বনমানুষ। গব্‌রাও মনে করে শহরে সাপের সংখ্যা বেশী। বানে মাঠ ডুবে গেলে সাপেরা যেমন ভিটেয় এসে জড়ো হয়, তেমনি গ্রামের সাপেরা যারা গ্রামকে মেনে নিতে পারেনি কিংবা গ্রামে মাথা উঁচু করে থাকবার মতো মানসিকতা নেই সেই ধান্দাবাজ ফেরেববাজ দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেরা শহরে উঠে যায়। জমিদাররা যেমন করতো আগে। অবশ্য এটাও জানে শহরে যেতেও বাধ্য কেউ কেউ। তার সংখ্যা নিতান্তই কম। তাই শহর থেকে গ্রামে এসে সে ঘর করেছে, কৃষক-সমিতির কর্মী হয়েছে সে। শহরের অন্ধকারে সে আর ফিরে যাবে না। তাই তারা ঠিক করেছে নিজেদের মোকাবিলা নিজেদের-কেই করতে হবে।

একটা মিছিল চলছিল। মিছিল। পুরোভাগে অবশ্যই গব্‌রা। তার নেশা পুরোপুরি তখনো কেটে গেছে দেখে তেমন মনে হয়নি। সমস্ত রিক্‌সাওয়ালারাই আছে। তাদের বৌ-ছেলেও আছে। কয়েকজন শ্লোগান দিচ্ছিল ওরা: 'রানীচক রাস্তায় অটো চালানো চলবে না। রিক্‌সার নামে মেয়েদের নিয়ে বেলেল্লাপনা বন্ধ করো।'

'রিক্সার উপর আঘাত হলে ধোলাই হবে পেটাই হবে।'

বানভাসি শহরের মালিকেরা হাসছিল। একজন ইয়ার্কি মেরে জিগ্যেস করলে, 'ওহে, বাজারে এতো হাসা-হাসি হচ্ছে তবু ডিমের দাম এতো কেন হে।' অন্যজন বললো, 'আই. আর. ডি. পি.'র ঋণ মিটেনি বলে।' কথাটা গবুরার কানে যেতেই গালাগালি দেয়। সুযোগ পেলে চোড় ছাড়িয়ে নেবে। শ্রেণী-চেতনায় তার ঘৃণা বোধ জেগে উঠে। কিন্তু দুটো শ্রেণীর এই সহাবস্থান মেনে নিতে পারে না। মোটর সাইকেল চড়ে, চাকরী করে যে নেতা মোটা মাইনে পায় তার নাকে ঘুষি মারতে ইচ্ছে করে তার। 'ই শালারা আমাদের কথা কি ভাববে। উ তো লাসবন্দীর সময়েও ছিল। ওইরকম নেতাই তো ছিল। কই তখন তো পঞ্চাশ টাকার লেশী পাইনি। এইরকম নেতা এখন এত কেন হচ্ছে হে! ই শালাদের একদম বিশ্বাস নেই যে কুন সময় খুন করে দিবে। শালা চশমখোর।' গবুরা সারাদিন ব্যস্ত আছে। পোস্টার সাঁটা হচ্ছে দেওয়ালে দেওয়ালে। উত্তেজনা চলছে মৃত্যুখনি গ্রামে।...বানভাসি-রানীচক রাস্তা। রাস্তার পাশে মোটা খাল। খালের ধারে শ্মশান। শ্মশানের ধারে গবুরার ঘর। ঘরের মধ্যে রেবতী একা। একাই বাটনা বাটে। কুটনো কুটে। ভাত রাঁধে। ভাত খায়। ভাত খাওয়ায়।

ভাত খেতে বিকেল হয়ে যায় গবুরার। আলুভাতে ভাত খায় গবুরা। আলুটা ঠাণ্ডায় চটচটে হয়ে গেছে। ভাতগুলো ঠাণ্ডা জল। কড়কড়ে। গাইটা বাঁধা আছে। রিক্সা ঘরের পাশেই। আজ পাঁচদিন তাতে কোন খদ্দের নেই। গাইটিকে বাঁচাবার জন্যে খড় কেনার টাকা নেই। বন্ধকের পয়সায় ক'টা খড় হবে? ক'দিন বাঁচাবে? তাহলে কি হাজরাবেড়েতে ছ'টাকা সের দামে গাইটা বিক্রী করে দেবে। তাহলে লোন কে শোধ করবে?

গাইটা 'বাঁ বাঁ' করে। 'বাঁ' 'বাঁ'। খিদে পেয়েছে। খিদে। খুব খারাপ লাগছিল। বন্ধকের পয়সায় ক'আঁটি খড় হবে। ক'দিন চলবে। আবার-গাইটা ডাকলো 'বাঁ' 'বাঁ'। রেবতী থাকতে পারল না। ছাউনির চাল থেকে একটা আঁটি টেনে নিল। গবুরা বললো, 'সব.

আঁটি নষ্ট করিসনি বউ, কাল একটা ব্যবস্থা করব।'

কার্তিক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে:, গবুরা কাকা পার্টি অফিসে পুলিশ এসেছে, তোমাকে ডাকছে। বন্দুক হাতে দু'জন কনস্টেবলও আছে।'

গবুরা খেতে খেতেই বলল, 'শালাদের শুতে বলগে যা বনমালীর ঘরে ডাকু আছে, দেগা শালাদের। অটোকে মারতেই শালাদের চোঙা ফেটে গেল। আর এতদিন কি খাই কি করে চলে শালারা তো আসেনি। জিগ্যেস করেনি। আমাদের কুন নেতা আছে?' এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল।

কার্তিক বলে, 'কারা আবার থাকবে—যারা থাকে তারাই। ভজাকাকা আছে।'

নানা কথা বলতে বলতে দু'জনে পেঁছে যায়। প্রায় সন্ধ্যা তখন। ভজাকাকা বলল, 'রিক্সারা বাড়াবাড়ি করেছে। এখন শ্রেণী-সংগ্রামের চেয়ে শ্রেণী-মৈত্রী দরকার।' পুলিশকে বললে, 'ওরা জানে না কিছু, বোঝে না কিছু, আমি আর কি করব। আইন যা তাই-ই হবে।'

গবুরা শ্রেণী-ফ্রেনী বোঝে না। সংগ্রাম-মৈত্রী এসব বোঝাও তার কাজ নয়। যদিও বোঝা দরকার। সে বুঝতে পারেনি হয়তো চেষ্টা করেও। তবে সে এটা বোঝে একশোটা ইঁদুর আর দু'চারটে বেড়াল থাকলে সেথায় ইঁদুরের কাজটা কি সংগ্রাম না মৈত্রী! গবরা বলে, 'ভজাকাকা তোমরা কেলাতেই এসেছো—সংগ্রাম ছেড়ে মৈত্রী যখন বড় হইচে তখন তোমাদের লাসবন্দী হতে আর বেশী দেরী নেই।'

পুলিশ বললো, 'থানায় চলুন।'

গবুরা বললো, 'আমি একা নয়, একশো জন যাবো। কিন্তু এতদিন আপনার নাকের ডগেই যে সব ঘটছিল, স্যার। ঘুমিয়ে ছিলেন নাকি?'

বানভাসি শহর থেকে দূরে মৃত্যুখান গ্রামখানিতে কখন সূর্য

আজ ডুবেছিল গব্‌রা তা জানে না। কিন্তু যখন একা নয়, একশো মুখের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল : 'রিক্‌সা পথে অটো চালানো চলবে না।' 'রিক্‌সা-অটো ভাই ভাই, রিক্‌সা চালক ওতে নেই।' তখন মাথার উপর গহিন আকাশ থেকে নক্ষত্ররা ফুটে উঠেছিল। মিছিল চলে যাচ্ছিল বানভাসি শহরের দিকে। পেছনে হেঁটে যাচ্ছিল বন্দুকধারী কয়েকজন পুলিশ।

রেবতী দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মনে মনে বললো, 'কালকে কী হবে?'

এই শ্মশানের ধারে রানীচক রাস্তার উপর একটা লন্ঠনের আলোর ভেতর নিঃশব্দ নিথর রেবতীর কানে মিছিলের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে মৃত্যুখনি গ্রামখানিতে অন্ধকার নামল। কোত্থেকে একটা সাদা বেড়াল ডেকে উঠলো, 'ম্যাউ···ম্যাউ···ম্যাউ· '

—

(না-ঘরকা না-ঘাটকা)